বিশেষ ঘোষণা

'পরিচয়'-এর আগামী ভাদ্র সংখ্যাটি 'পরমাণু ও শান্তি' সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ উদ্দেশে পার[...] তেজের প্রয়োগ, বিশ্বমানবের শান্তি-প্রচেষ্টা, নিরস্ত্রী[...] সমস্যা, তেজস্ক্রিয়তার ফলাফল, সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরোধী [...] ও চলচ্চিত্র, মস্কো নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের বিবরণ ও [...] ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি সুনির্বাচিত প্রবন্ধ এই [...] প্রকাশিত হবে।

এই সংখ্যার লেখকদের মধ্যে আছেন : জে. বি. এস. হ[...] বি. ডি. নাগচৌধুরী, আর. কে. মণ্ডল, বিবেকানন্দ মুখো[...] গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সুনীল সেন, শ্যামল চক্রবর্তী, চি[...] সেহানবীশ, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুব গুপ্ত, শঙ্কর চ[...] অমল দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

মস্কো নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে গৃহীত লেখকদের [...] প্রতি আবেদন, সার্ত্র ও লাঙ্গ-এর প্রবন্ধ এবং পিকা[...] অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর আঁকা ছবি এই স[...] বিশেষ আকর্ষণ।

দাম এক টাকা

পরমাণু ও শান্তি সংখ্যা

পরিচয়



ভাদ্র

সূচীপত্র

শান্তি ও পরমাণু সংখ্যা

প্রচ্ছদচিত্র :
পাবলো পিকাসো
[মস্কো নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন উপলক্ষে অঙ্কিত]

আর্টপ্লেট :
পাবলো পিকাসো

রেখাচিত্র : কিয়োটাকা ওয়াজিমা

সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়

শারদীয় সংখ্যা বর্ধিত মূল্য ও প্রায় দ্বিগুণ কলেবরে মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।

প্রখ্যাত শিল্পীর আঁকা অভিনব প্রচ্ছদপট, দেশী ও বিদেশী চিত্রকরদের সুনির্বাচিত দুষ্প্রাপ্য চিত্রকর্মের অনেকগুলি প্রতিলিপি।

খ্যাতনামা প্রবীণ ও নবীন কবি-সাহিত্যিকদের মননসমৃদ্ধ রচনাসম্ভার।

বিস্তৃত সূচীপত্র পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হবে।

এজেন্টরা সঠিক চাহিদা জানান পত্রিকা প্রকাশের পর কোনো ক্রমেই বাড়তি কপি সরবরাহ করা যাবে না।

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রাহকরা শারদীয় সংখ্যাটি সরাসরি 'পরিচয়' কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করলে ভালো হয়। যাঁরা হাতে নেবেন তাঁরা অনুগ্রহ করে সত্বর তাঁদের নাম ও গ্রাহক সংখ্যা জানাবেন।

সম্পাদকীয়

পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতের বিপদ সম্পর্কে আমরা হয়তো যথেষ্ট সচেতন নই—এই বোধের দ্বারা চালিত হয়ে আমরা 'পরিচয়'-এর এই বিশেষ সংখ্যাটির পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে আমাদের উপলব্ধি করতে হয়েছে যে বিষয়টি এত ব্যাপক এবং বিষয়টির সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ ও অন্যান্য নানা জটিল প্রশ্ন এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে 'পরিচয়'-এর সীমিত পরিসরে ও অল্পসময়ের প্রস্তুতিতে এই পরিকল্পনার সম্যক রূপায়ন সম্ভব নয়। ফলে বাধ্য হয়ে আমাদের মূল পরিকল্পনাকে নানাভাবে সংকুচিত করতে হয়েছে। যেমন, শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক তেজের প্রয়োগ সম্পর্কে একটি আলোচনা এই সংখ্যায় থাকা উচিত ছিল। প্রবন্ধটির রচনা সময় সাপেক্ষ, অতএব বাধ্য হয়ে পরবর্তী কোনো সংখ্যার জন্যে মূলতুবী রাখতে হলো। তবুও, আমাদের মনে হয়, অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশ করতে পেরেছি তা থেকে বর্তমান কালের সবচেয়ে জরুরি সমস্যা ও সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তৈরি করা সম্ভব হবে। পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের হুমকি আজকের দিনের পৃথিবীকে যে সর্বাত্মক বিপদের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে সেখানে আমাদের কারও পক্ষেই আত্মবিস্মৃতির এতটুকু অবকাশ নেই। আমাদের নিজেদের প্রতি এবং আমাদের বংশধরদের প্রতি বিন্দুমাত্র কর্তব্যবোধ যদি আমাদের থাকে তাহলে এই বিপদের বিরুদ্ধে আমাদের নিশ্চয়ই তৎপর হতে হবে। 'পরিচয়'-এর বর্তমান সংখ্যাটিকে এই বিপদের বিরুদ্ধেই একটি সময়োচিত হুঁশিয়ারি হিসেবে আমরা উপস্থিত করতে চেয়েছি।

'পরিচয়'-এর বর্তমান সংখ্যাটির পাণ্ডুলিপি প্রেসে যাবার পরে অন্য একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। তিন ও চার নম্বর ভোস্তোকের পৃথিবী-পরিক্রমা। পারমাণবিক বিস্ফোরণে ও তেজস্ক্রিয়তায় কলুষিত আমাদের এই পৃথিবীর মানুষের সামনে ভোস্তোক এক অকল্পিতপূর্ব ভবিষ্যতের

আশ্বাস। পৃথিবীতে যদি শান্তি বজায় থাকে, পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির আবহাওয়া গড়ে তোল তাহলে বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির বিস্ময়কর অগ্রগতির ধাপে মানুষ যে নতুনতর ইতিহাসের নায়ক হয়ে উঠবে—ভোস্তোক নিঃসন্দেহ স্থচনা মাত্র।

অতি অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে 'পরিচয়'-এর বর্তমান সংখ্যাটি যে পাঠকদের কাছে উপস্থিত করতে পেরেছি সেজন্যে প্রথম ও প্র কৃতিত্ব 'পরিচয়'-এর লেখকদের প্রাপ্য। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন।

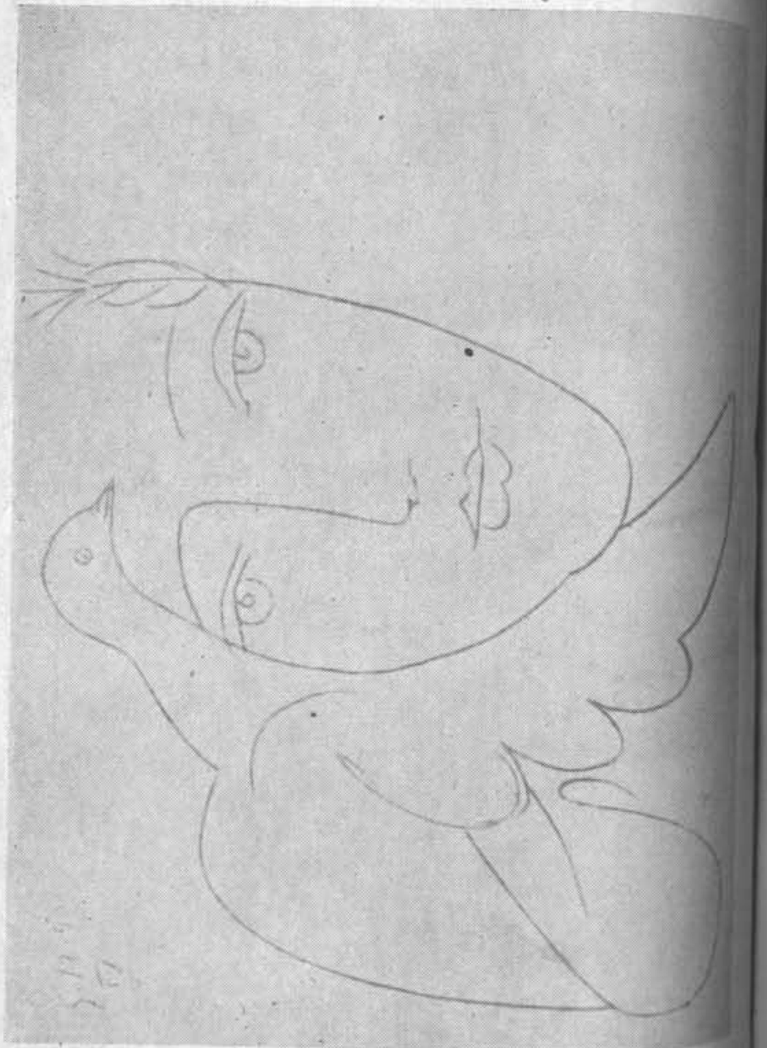
অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেনের প্রবন্ধটি মূল ইংরেজি তাঁর বিশেষ অনুমতিক্রমে বাংলায় অনূদিত হয়ে পুনঃপ্রকাশিত হলো।

ডঃ রাধাকান্ত মণ্ডল বোস রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের তরুণ গবে কর্মী। অতি-ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি 'পরিচয়'-এর জন্যে একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

অন্য যাঁদের লেখা আমরা প্রকাশ করতে পেরেছি তাঁরা সকলে আমাদের সহযাত্রী বন্ধু। তাঁদের কাছে ভবিষ্যতেও আমরা আ অনেক দাবি নিয়ে উপস্থিত হব।

পরিশেষে, 'পরিচয়'-এর পক্ষে বিশেষ আনন্দ ও গর্বের কথা যে মস্কোর নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সমাগত বিশ্ব-মনীষীরা 'পরিচয়'- পাঠকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাক্ষর প্রেরণ করেছেন।

আশা করি সংখ্যাটি পাঠকঁদের কাছে সমাদৃত হবে এবং তাঁ তাঁদের মতামত ও সমালোচনা পাঠিয়ে আমাদের উৎসাহিত করবেন।



স্কেচ
পাবলো পিকাসো

তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

জে. বি. এস. হলডেন

আমেরিকান গভর্নমেণ্ট আবার নতুন পর্যায়ে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছেন। আপনারা লক্ষ্য করবেন, আমি লিখেছি "আমেরিকান গভর্নমেণ্ট"—"আমেরিকা" বা "আমেরিকানরা" নয়। এই সহজ সতর্কতাটুকুর প্রয়োজন আছে। এর ফলে আমাদের চিন্তা আরো স্বচ্ছ হবে, ঘৃণা আরো হ্রাস পাবে। আমরা যদি লিখি বা বলি "আমেরিকা" বা "চীন", "পাকিস্তান" বা "পর্তুগাল", তা হলে মনে হতে পারে যে আমরা দেশবিশেষের কথা বলছি, যার প্রতীক হতে পারে একটি ঈগল বা ড্রাগন বা অন্য কিছু, এবং যাকে আমরা খুশিমতো পোষ মানাতে পারি বা খুন করতে পারি। এমন কি আমরা যদি বলি "চীনারা ভারতভূমি আক্রমণ করেছে"—তাহলেও কথাটা অর্থহীন হয়। কারণ, চীনা আছে ষাট কোটি, তাদের মধ্যে আক্রমণাত্মক ভূমিকা থাকতে পারে বড় জোর কয়েক শতের। অন্যদিকে, বোমা বিস্ফোরিত হলে বা এ-ধরনের অন্য কোনো ঘটনা ঘটলে মন্ত্রীসভার প্রত্যেকটি সদস্যকেই সেজন্যে দায়ী হতে হয়। যদি তাঁর মতের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটে থাকে তাহলে পদত্যাগ করার অধিকারও তাঁর আছে। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যকে আমি জানি যাঁরা বিশেষ কোনো সরকারী কাজের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহশীল হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন নি। তাঁরা নিশ্চয়ই নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন, তাঁদের দেশসেবাটা এতই মূল্যবান যে দেশবাসীকে তা থেকে বঞ্চিত করার কোনো অধিকার তাঁদের নেই। অথচ তাঁরা যদি পদত্যাগ করতেন তা হলেই হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিকারের দেশসেবা করা হতো।

আন্তর্জাতিক আইন

বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের খ্রীষ্টমাস দ্বীপে। এর ফলে আমেরিকান ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আন্তর্জাতিক আইনকে জঘন্যভাবে লঙ্ঘন করেছেন। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে, উপকূলের কাছে খুব সরু একটি ফালি বাদ দিলে সমুদ্র মুক্ত এলাকা। কিন্তু আমেরিকান ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সমুদ্রের কোনো কোনো এলাকায় জাহাজ-চলাচল নিষিদ্ধ করেছেন। সাম্প্রতিক কালে সোভিয়েত গভর্নমেণ্টও পর-পর কতকগুলো পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন এবং তার ফলেও সারা পৃথিবীর কয়েকজন নিরীহ মানুষের প্রাণহানির কারণ অবশ্যই ঘটেছে। কিন্তু সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট কোনো ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেন নি।

জবাবে আমাকে হয়তো শুনতে হবে যে সমুদ্র সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইন সেকেলে হয়ে গিয়েছে। অবশ্যই হয়েছে। আমি যখন ভারতের নাগরিক হই, আমাকে অঙ্গীকার করতে হয়েছে যে ভারত সাধারণতন্ত্রের আইন আমি মেনে চলব। তা সত্ত্বেও আমি মনে করি, ভারতে কতকগুলো আইন আছে যা অন্যায়, কতকগুলো অর্থহীন, আর অধিকাংশই সেকেলে। কিন্তু একেবারে কোনো আইন না মানার চেয়ে সেকেলে আইন মেনে চলা ভালো। এ-প্রসঙ্গে ব্রিটেনের আইনের কথা যদি ওঠে তো বলি, ব্রিটেনের আইন ভারতের আইনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি সেকেলে। ব্রিটেনের আইন মেনে চলব এমন প্রতিশ্রুতি আমি কোনো কালেই দিইনি এবং মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই তা ভঙ্গ করেছি। আইন মোটামুটি ধনীদের স্বার্থরক্ষা করে। ক্ষুধার্ত মানুষ যদি চুরি করে তা হলে আমরা তাকে জেলে পুরি, কিন্তু এ কথা ভাবি না যে লোকটি বিশেষ রকমের বদ। কিন্তু ধনী ব্যক্তি যদি চুরি করে তবে তার সপক্ষে কোনো যৌক্তিকতাই নেই। আর ধনীরা যখন ব্যাপকভাবে আইনভঙ্গ করতে শুরু করে তখনই বিপ্লব হয়ে থাকে আর বিপ্লবের সময়ে আইনভাঙ্গকারী ধনীদের সম্পত্তি খোয়া যায়। জাতি সম্পর্কেও একই কথা। সবচেয়ে ধনী আর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী জাতির গভর্নমেণ্টের আইনভঙ্গ করার কোনো যুক্তিই নেই। এই আইনভঙ্গের ব্যাপারটা চলতে থাকলে শেষপর্যন্ত বিক্ষুব্ধ হতে হয় এবং তাতে জাতির পক্ষে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। এই বিচারে আমেরিকান ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যা করছেন তা যেমন অসঙ্গত তেমনি অন্যায়।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটার পরে নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি

হয়ে থাকে। এই পদার্থগুলোর পরিণতি কী হয় তা অনেকগুলো বিষয়ের ওপরে নির্ভরশীল। কতখানি উচ্চতায় বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছে তাও এ-প্রসঙ্গে বিচার্য। বিস্ফোরণ যদি মাটির কাছাকাছি হয় তাহলে প্রচুর পরিমাণে স্থানীয় ভস্মপাত হবে। বিস্ফোরণ যদি উঁচুতে হয় তাহলে অধিকাংশ তেজস্ক্রিয় পদার্থ উঁচুতে উঠে যাবে এবং সম্ভবত স্ট্রাটোস্ফিয়ারে গিয়ে পৌছবে। বায়ুমণ্ডলের যে বিক্ষুব্ধ স্তরে আমরা বাস করি তার ঠিক ওপরের স্তরকে বলা হয় স্ট্রাটোস্ফিয়ার। এই স্তরের একটি বৈশিষ্ট্য, উচ্চতা কমা-বাড়ার সঙ্গে এই স্তরের তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। এই স্তরের তাপমাত্রা অব্যবহিত ওপরের বা নিচের স্তরের তাপমাত্রা থেকে অপেক্ষাকৃত কম। তেজস্ক্রিয় ভস্মের মেঘ এই স্তরে পৌছবার পরে পৃথিবীর চারদিকে ভেসে বেড়াতে থাকে—তবে উত্তরে বা দক্ষিণে খুব বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

খ্রীষ্টমাস দ্বীপের অবস্থান বিষুবরেখার ঠিক উত্তরে। ফলে, এই দ্বীপের পারমাণবিক বিস্ফোরণের মারাত্মক ফল উত্তর ভারতে যতটুকু, দক্ষিণ ভারতে তার চেয়ে বেশি ; আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যতটুকু, উত্তর ভারতে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। আমেরিকানরা খুবই বিবেচনার পরিচয় দিয়েছে বলতে হবে!

তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত

ভারতের মাটিতে, প্রধানত বর্ষার সময়ে, নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ নেমে আসবে। তাদের কিছুটা গিয়ে মিশবে পানীয় জলের সঙ্গে, কিছুটা উদ্ভিদে এবং উদ্ভিদ থেকে দুধে। কোনো কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ—যেমন সিজিয়াম—মানুষের শরীরে খুব অল্পক্ষণই থাকতে পারে এবং তার ফলে বিশেষ ক্ষতিকারক না হবারই সম্ভাবনা ; যদিও সঙ্গে সঙ্গে একথাও অবশ্যই বলতে হবে যে আমাদের মধ্যে অন্তত কয়েকজনের মৃত্যুর কারণ হবে এই সিজিয়াম বা এ-ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ। রাসায়নিক বিচারে সিজিয়াম অনেকটা পটাশিয়ামের মতো। যতদূর জানা যায়, এই পদার্থটি শরীরের কোনো অস্থিতে সংস্থিত হয় না। যেমন হতে পারে অন্য দুটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ—স্ট্রনশিয়াম ও আয়োডিন।

স্ট্রনশিয়াম একটি ধাতু, রাসায়নিক ধরনধারণের দিক থেকে ক্যালসিয়ামের সঙ্গে তুলনীয়। আমাদের শরীরের অস্থিতে প্রচুর পরিমাণে জল আছে, আর

আছে কিছু জৈব পদার্থ। কিন্তু অস্থির কঠিন অংশটুকু প্রধানত ক্যালসিয়াম ফসফেট-এ। স্বাভাবিক শরীরের অস্থিতে কিছু পরি স্ট্রনশিয়ামও আছে। যদি কোনো বাড়ন্ত শিশুর খাদ্যে স্ট্রনশিয়াম থাকে তা এই পদার্থটি তার অস্থিতে সংস্থিত হয়ে যাবারই সম্ভাবনা। এমন কি এক পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরেও অস্থি ও রক্তের মধ্যে সবসময়ে ক্যালসিয়াম পর আদানপ্রদান হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি ঘটে থাকে খুবই ধী তা সত্ত্বেও যদি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের খাদ্য বা পানীয়ে স্ট্রনশিয়াম থা তা হলে তা তার অস্থিতে সংস্থিত হতে পারে এবং আবার অতি ধীরে নিঃসৃত হয়ে যায়।

স্ট্রনশিয়াম যদি তেজস্ক্রিয় না হয় তাহলে সাধারণত তা ক্ষতিকর ন ব্যক্তিগতভাবে আমি এ-বিষয়টি সম্পর্কে সকলের চেয়ে বেশি জানি। একদিনে পঞ্চাশ গ্রাম স্ট্রনশিয়াম ক্লোরাইড গলাধঃকরণ করেছি। কারও এই অভিজ্ঞতা আছে বলে আমার জানা নেই। ফলে প্রথম দিন তি আমার মধ্যে নানা দিক থেকে কিছু অস্বাভাবিকতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছি কিন্তু শয্যাশায়ী হবার মতো অসুস্থ আমি হইনি। স্ট্রনশিয়াম ক্লোরাই চেয়ে স্ট্রনশিয়াম কার্বনেট দামে শস্তা। এক গ্রাম স্ট্রনশিয়াম কার্বনেট কি একজন শিশুর পক্ষেও ক্ষতিকারক নয়।

আয়োডিন জমা হয়ে থাকে থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ডে। এই গ্ল্যাণ্ডটির অবস্থান গ্রী সামনের দিকে, যেখানে গ্রীবা এসে মিশেছে ধড়ের সঙ্গে। শরীরের অ তন্ত্রীতে অক্সাইডেশন প্রক্রিয়াকে সঠিক মাত্রায় অব্যাহত রাখার জন্যে ধরনের হরমোন্-এর প্রয়োজনীয়তা আছে। আয়োডিন অঙ্গীভূত হয় থায়রয়ে গ্ল্যাণ্ডের এইসব হরমোনে। আমাদের শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কয়ে অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সা ও ফস্ফরাস। এই উপাদানগুলো আমরা খাদ্য থেকে গ্রহণ করি। এ ছাড়া আমাদের খাদ্যে অন্য অনেক উপাদান থাকে। কিন্তু সেগুলো আমাদের শ থেকে খুব অল্পসময়ের মধ্যেই নিঃসৃত হয়ে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়ে ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, সীসে ওআর্সেনিক। পরিমাণে যদি খুব অল্প হয় তা সীসে বা আর্সেনিক শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু এই অ-ক্ষতিক মাত্রার সীসে বা আর্সেনিকও যদি কয়েক মাস ধরে বা কয়েক বছর প্রতিদিন খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করা হয় তাহলে তা প্রাণঘাতী হতে পার

এই পদার্থটি বহু মাস ধরে শরীরের মধ্যে থেকে যেতে পারে এবং এমন কি মৃত্যুর পরেও বহুকাল পর্যন্ত থেকে যায়। এই কারণেই যদি কোনো মুসলমানকে বা খ্রীষ্টানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে হয় তা হলে সীসে বা আর্সেনিক ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। একজন মুসলমান বা খ্রীষ্টানের শব মৃত্যুর বহুকাল পরেও কবর খুঁড়ে বার করা যেতে পারে।

হত্যাকারীর ভূমিকায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ

যদি কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর নিউক্লিয়স বিস্ফোরিত হয় তাহলে ছিটকে বেরিয়ে আসে একটি ক্ষুদ্র কণিকা ও একগুচ্ছ রশ্মি। এই কণিকাটি সাধারণত হয়ে থাকে একটি ইলেকট্রন বা বিটা কণিকা বা হিলিয়াম নিউক্লিয়স বা আল্ফা কণিকা। আর এই রশ্মি সাধারণত হয়ে থাকে গামা রশ্মি, যা স্বভাবের দিক থেকে অনেকটা কণিকার মতোই। তাদের গমনপথে যদি কোনো জীবন্ত তন্ত্রী পড়ে তা হলে হয় তারা সেখানেই থেমে যায় কিংবা তাদের গতি হয় স্তিমিত। তাদের তেজ বা এনার্জি নিঃসরিত হয় পুরোপুরি কিংবা আংশিক ভাবে। এর ফলে ক্রোমোসোমের মতো অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটি কাঠামোর মধ্যেও ভাঙন আসতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে-ব্যাপারটি ঘটে থাকে তা হচ্ছে জীবকোষের অন্যান্য উপাদানস্থিত জল থেকে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু রাসায়নিক দিক থেকে অতিমাত্রায় সক্রিয় অণু সৃষ্টি করা। এই অণুটি HO হতে পারে বা HO_2। তারপরে সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশের মধ্যে, একটি বৃহৎ অণুর সঙ্গে এই অণুটির রাসায়নিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া ঘটে এবং বৃহৎ অণুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে দ্রুতগামী কণিকা বা রশ্মি জীবকোষের ক্ষতিসাধন করে। তারপরে কয়েকটি সম্ভাবনা থাকে। জীবকোষটি হয়তো পুরোপুরি ভাবেই নিজেকে মেরামত করে নিতে পারবে। কিংবা জীবকোষটির সরাসরি মৃত্যু ঘটবে। কিংবা জীবকোষটি পুনরুৎপাদনের ক্ষমতারহিত হবে। যদি ব্যাপকভাবে জীবকোষের মৃত্যু ঘটতে থাকে তাহলে কয়েকদিনের মধ্যে মানুষটিরও মৃত্যু হতে পারে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অনেকেরই মৃত্যু হয়েছিল এই কারণে। যে-সব জীবকোষের কাজ অপরিহার্য রকমের জরুরি—যেমন নতুন রক্ত বা চামড়া গড়ে তোলা—তাদের মধ্যে শতকরা একভাগের মতো জীবকোষের যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে মারাত্মক কোনো ফল হবে না বলেই আশা করা চলে। কিন্তু গর্ভের

শিশুরা পূর্ণবয়স্ক মানুষের চেয়ে বা এমন কি শিশুদের চেয়েও অনেক স্পর্শকাতর। হয়তো এমন কয়েকটি জীবকোষের মৃত্যু ঘটল যা চোখ হাত গড়ে তুলত—তার ফলে শেষপর্যন্ত জন্ম হলো বিকট একটি জীবের। কি যদি অন্যান্য জীবকোষ মৃত জীবকোষের স্থলাভিষিক্তও হয় তাদের পক্ষে ঠিক সময়টিতে কাজ শুরু করা সম্ভব হয় না। আর মানুষের শরীর গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি এতই জটিল ও এতই সূক্ষ্ম যে সময়ের সামান্য হেরফেরেও বড় রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

আর পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনাটা অন্যভাবে আসে। এক্ষেত্রে জীবকোষের কাজের ধরন পালটে যায়। কিন্তু জীবকোষটি বেঁচে আছে এবং জীবকোষ থেকে পুনরুৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু জীবকোষটি নিজেকে পুরোপুরি মেরামত করে নিতে পারছে না। এ-ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় মিউটেশন বা বিকৃতি। মিউটেশন কখনো কখনো হয়তো সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তা কচিৎ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিউটেশনের ফল প্রাণনাশ। পশুদের মধ্যে দেখা যায় তেজস্ক্রিয়তার নানাবিধ লক্ষণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অকালমৃত্যু। কিন্তু পশুদের মধ্যে আরো অনেক বেশি সংখ্যায় মৃত্যু হয় এমন একটি রোগে যা মানুষের মধ্যেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হয়। এই রোগটির নাম কর্কট বা ক্যানসার।

ক্যানসার ও লিউকিমিয়া

মানুষের শরীরে কতকগুলো কোষ কোনো সময়েই বিভক্ত হয় না। মস্তিষ্কের কোষ সম্পর্কে সম্ভবত এই উক্তি করা চলে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কোষ তখনই বিভক্ত হয় যখন তাজা কোষের প্রয়োজনীয়তা থাকে। একটি নিরোগ যকৃৎ যদি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা হলে সেই ক্ষতি এইভাবে পূরণ হয়ে যেতে পারে। অন্যান্য কোষরা অনবরতই বিভক্ত হচ্ছে। তবে অবশ্য শরীরের যতখানি প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি হারে নয়। যেমন দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক গায়ের চামড়ার কোষ। এই কোষগুলো অনবরত বিভক্ত হচ্ছে। প্রত্যেকবার বিভক্ত হবার পরে দুটি করে "কন্যা" কোষ সৃষ্টি হয়ে থাকে। একটি "কন্যা" শক্ত হতে হতে শেষপর্যন্ত মারা যায় এবং তার খসখসে অবশেষটি ঘষা খেয়ে গা থেকে খসে পড়ে। অন্য "কন্যাটির" অবস্থান আরো গভীরে। সেই "কন্যাটি" তখন আবার বিভক্ত হয়। এখন, চামড়ার কোনো একটি অংশে যদি

বেশি ক্ষয় হতে থাকে—যেমন হতে পারে পায়ের গোড়ালিতে—তাহলে সেই বিশেষ অংশে কোষ-বিভক্তির হারও খুবই বেড়ে যায়।

যে-সব কোষ স্বাভাবিক অবস্থায় বিভক্ত হয় না, তারা যদি বিভক্ত হতে শুরু করে, কিংবা স্বাভাবিক অবস্থায় যারা বিভক্ত হয় তাদের বিভক্তির হার যদি অস্বাভাবিক রকমের বেড়ে যায়—তা হলে যে অবস্থাটি সৃষ্টি হয় তারই নাম টিউমার। টিউমারের সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্ত হচ্ছে আঁচিল। এই দৃষ্টান্তটি পরিচিত কারণ আঁচিল আমরা চোখে দেখতে পাই ও হাত দিয়ে ছুঁতে পারি। আমার গায়ের চামড়ায় বর্তমানে কোনো আঁচিল নেই। কিন্তু সম্ভবত আমার শরীরের অভ্যন্তরের প্রত্যঙ্গে অদৃশ্যভাবে গোটাকতকের অস্তিত্ব আছে।

টিউমার যদি ছড়িয়ে না পড়ে তা হলে তাকে বলা হয় "বিনাইন"। কিন্তু এই টিউমারও পীড়াদায়ক হতে পারে, বা এমন কি মৃত্যুর কারণও—যদি টিউমারের অবস্থান হয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গে। তবে সাধারণত এ-ধরনের টিউমার শল্য-চিকিৎসায় অপসারিত হতে পারে। যে-সব টিউমার ছড়িয়ে পড়ে তাকে বলা হয় "ম্যালিগন্যান্ট" বা ক্যানসার। লিউকিমিয়া এমনি একটি ম্যালিগন্যান্ট পীড়া হিসেবে গণ্য। অস্থির মজ্জায় এবং অন্যান্য তন্ত্রীতে এমন কতকগুলি কোষ আছে যা চামড়ার কোষের মতো অনবরত বিভক্ত হচ্ছে। একটি কন্যা-কোষ নিঃসৃত হয় রক্তের মধ্যে এবং সেখানে কয়েক সপ্তাহ বা মাস ধরে বেঁচে থাকে। একেই বলা হয় রক্তের শ্বেতকণিকা বা "লিউকোসাইট"। এই শ্বেতকণিকা জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিহত করে। লিউকিমিনিয়া হলে এই শ্বেতকণিকাই প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি হতে থাকে এবং বলা বাহুল্য সারা শরীরে তা ছড়িয়ে পড়ে। রোগটিকে বোঝাবার জন্যে খুব একটা মোটা রকমের উপমা দেওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী থাকে অন্য রাষ্ট্রের সম্ভাব্য আক্রমণকে ঠেকাবার জন্যে। রাষ্ট্রের রক্ষাব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করাই সৈন্যবাহিনীর বিশেষ দায়িত্ব। কিন্তু এমন রাষ্ট্র যদি থাকে যেখানে আভ্যন্তরীন ব্যাপারেও সর্বত্র এই সৈন্যরাই জাঁকিয়ে বসেছে তা হলে এই অবস্থাটিকে তুলনা করা যেতে পারে লিউকিমিয়ার সঙ্গে।

ক্যানসারের গবেষণায় প্রচুর তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু আমার নিজের ধারণা, এই গবেষণার বেশির ভাগটাই নিরর্থক, কারণ ভুল প্রশ্নটি তোলা হয়েছে। গবেষকরা প্রশ্ন তুলেছেন, "ক্যানসারগ্রস্ত কোষকে ধ্বংস

করার উপায় কী ?" বরং অনেক বেশি ফল পাওয়া যেত যদি প্রশ্ন... এই : "অধিকাংশ কোষই কেন বিভক্ত হয় না, কিংবা, তখনই শুধু বি... হয় যখন আরো অধিকসংখ্যক সমজাতীয় কোষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দে... একটি উপমার সাহায্যে বক্তব্যটি স্পষ্ট করা যাক। আমরা প্রশ্ন তুলতে পা... "কোনো কোনো লোক কেন চুরি করে ?" কিন্তু এই প্রশ্নের মধ্যেই নিজে... সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন তুলতে হবে—"অধিকাংশ লো... কেন চুরি করে না ?" জবাবে নিশ্চয়ই একথা বলতে হবে যে এই লোকে... মা-বাবারা তাদের এমনভাবে মানুষ করেছেন যে তারা চুরিকে ঘৃণা ক... শিখেছে। কখনো কখনো চোরকেও শোধরানো যেতে পারে।

সুইডেনের একটি গবেষণা থেকে এ-সম্পর্কে একটি সূত্র পাওয়া গিয়ে... এই গবেষণায় জানা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে লিউকিমিয়াগ্রস্ত কোষের নিউক্লি... স্থিত ক্রোমোসোমের একটি বিশেষ অংশ খোয়া যায়। স্বাভাবিক মানু... ক্ষেত্রে একটি নিউক্লিয়সের মধ্যে তেইশটি বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোসোম থাক... পারে। উল্লিখিত গবেষণায় দেখা যায়, লিউকিমিয়াগ্রস্ত অধিকাংশ কো... ক্ষেত্রে এই তেইশটি ক্রোমোসোমের মধ্যে একটির একই অংশ খোয়া গিয়ে... খুব সম্ভবত এই বিশেষ অংশের মধ্যেই এমন কিছু জিনিস আছে যা মজ্জা... কোষের বৃদ্ধির মাত্রা—অর্থাৎ শ্বেতকণিকার সৃষ্টির মাত্রা—কমিয়ে দে... যাই হোক না কেন, লিউকিমিয়া রোগীর ক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় যে... বিশেষ অংশটি খসে পড়েছে। এ থেকে নিরাময়ের একটি পথ পাওয়া যে... পারে। ক্রোমোসোমের যে বিশেষ অংশটি খোয়া গিয়েছে সেটিকে যদি কৃত্রি... উপায়ে তৈরি করা সম্ভব হয় তাহলেই বিপথগামী কোষগুলোকে আবা... স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব হতে পারে।

আংশিক রক্ষাব্যবস্থা

যদি তেজস্ক্রিয় স্ট্রনশিয়ামের নিউক্লিয়স সমন্বিত একটি পরমাণু মানুষের শরী... সংস্থিত হয় তাহলে এই নিউক্লিয়সটির বিস্ফোরণ সম্ভবত কুড়ি বছর ধরে চল... বিস্ফোরণের মধ্যে কোনো বিরতি থাকবে না এবং বিস্ফোরণের পৌনঃপুনিক... হ্রাস পাবে খুবই ধীরে ধীরে। এই বিস্ফোরণের ফলে অন্য কয়েক ধরনে... তেজস্ক্রিয় স্ট্রনশিয়াম সৃষ্টি হয়ে থাকে কিন্তু এই স্ট্রনশিয়ামের নিউক্লিয়সগু... অর্ধা[illegible] দুই মাসের মধ্যেই বিস্ফোরিত হয়ে যায়। সুতরাং তেজস্ক্রিয় ভস্মপা...

ভারতের মাটিতে নেমে আসার আগেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিশেষ পর্বের বিস্ফোরণ সমাধা হয়ে যাবে। কিন্তু যে বিশেষ স্ট্রনশিয়ামের বিস্ফোরণ কুড়ি বছর ধরে চলতে থাকে তা থেকে নিঃসৃত ইলেকট্রন অস্থির কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে—যার ফলে দেখা দিতে পারে, ক্যানসার—বা, মানুষের কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যার ফলে দেখা দিতে পারে লিউকিমিয়া। তেমনি, বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয়-আয়োডিনের অর্ধাংশ দুই মাস ধরে বিস্ফোরিত হতে পারে এবং তার ফলে থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ডের ক্যানসার হওয়া অসম্ভব নয়।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমি যা করতে চাই তা এই : আমি এক কিলোগ্রাম স্ট্রনশিয়াম কার্বনেট ও আধ কিলোগ্রাম পটাশিয়াম আয়োডাইড কিনেছি। যদি আমাদের অঞ্চলে তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিপাত হয় তাহলে আমি ও আমার পরিবারের লোকরা এই দুটি জিনিসই অল্প পরিমাণে খেয়ে যাব। যদি একগ্রামের পাচভাগের একভাগও খাই তাহলেও উভয়ের ক্ষেত্রেই হয়তো পরিমাণের দিক থেকে একটু বেশিই হয়ে যাবে। খুব অল্প পরিমাণে যদি কোনো পদার্থ গ্রহণ করা যায় তাহলে তা শরীরের মধ্যে বহুকাল ধরে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনা খুবই বেশি যে শরীরের কোনো একটি প্রত্যঙ্গে তা সংস্থিত হবে। কিন্তু পরিমাণ যদি বেশি হয় (২০০ মিলিগ্রাম স্ট্রনশিয়াম কার্বনেট বা পটাশিয়াম আয়োডাইডকে পরিমাণের দিক থেকে বেশি বলেই ধরা যেতে পারে) তাহলে শরীরের ভেতর থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা নিঃসৃত হয়ে যায়। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক, আমি আমার রক্তের মধ্যে স্ট্রনশিয়ামের পরিমাণকে দশগুণ বাড়িয়ে তুলেছি। এক্ষেত্রে আমার শরীর থেকে যে-হারে স্ট্রনশিয়াম নিঃসৃত হবে তা দশগুণের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের শরীরের অন্ত্র ও কিড্‌নির কাছে তেজস্ক্রিয় ও সাধারণ স্ট্রনশিয়ামের পার্থক্য ধরা পড়ে না। ফলে—যেহেতু আমি সাধারণ স্ট্রনশিয়াম খেয়ে চলেছি—আমার শরীর থেকে অনেক অল্প সময়ের মধ্যে স্ট্রনশিয়াম নিঃসৃত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, আমার শরীরের অস্থিতে তেজস্ক্রিয় স্ট্রনশিয়াম সংস্থিত হবার সম্ভাবনা কম।

আমার পূর্বতন সহকর্মী, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক পোচিন আয়োডিন আইসোটোপ নিয়ে গবেষণা করছেন। এই আয়োডিন আইসোটোপ খুবই দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অর্ধসংখ্যক নিউক্লিয়স বিস্ফোরিত হতে সময় নেয় আড়াই ঘণ্টা ও আট দিন। গবেষণায় জানা গিয়েছে, যদি

তেজস্ক্রিয় আয়োডিন শরীরের ভেতরে যাবার চার ঘণ্টা পরেও সাধা আয়োডিন খাওয়া যায় তাহলেও থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ডে আয়োডিন সংস্থিত হবা সম্ভাবনা অনেকখানি কমে। তবে আয়োডিনের মতো দ্রুতভাঙনশী আইসোটোপের বিপজ্জনক অস্তিত্ব তখনই সম্ভব যখন খুবই কাছাকাছি অল্প পারমাণবিক চুল্লি বা বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। অতএব মার্কিন বা সোভিয়ে পরীক্ষাকার্যের ফলে অন্তত এই ক্ষণস্থায়ী আইসোটোপ-জনিত বিপদের সম্ভাব ভারতের ক্ষেত্রে নেই। যেমন আছে দীর্ঘস্থায়ী আইসোটোপ-জনিত বিপদ কিন্তু তবুও আয়োডিন খাওয়াতে আপত্তি নেই। আমার মতে পরিমাণ হবে এই : পূর্ণবয়স্কের জন্যে প্রথম দিন ২০০ মিলিগ্রাম এবং তারপরে প্রতিদি ৫০ গ্রাম। শিশুদের জন্যে এই অনুপাতে আরো কম মাত্রায়। যদি এক লিটা জলে এক গ্রাম পটাশিয়াম আয়োডাইড মেশানো যায়, তবে এই মিশ্রি জলের ২০০ ঘন সেন্টিমিটারে ২০০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম আয়োডাইড পাও যাবে।

ভারতের অধিকাংশ লোকের পক্ষে স্ট্রনশিয়াম ও আয়োডিন কম্পাউ পাওয়া সম্ভব নয় এবং ক্রয় করাও সাধ্যাতীত। কিন্তু রসায়নের দিক থেকে স্ট্রনশিয়াম ও ক্যালশিয়ামের মধ্যে মিল এতই বেশি যে স্ট্রনশিয়াম না খেয়ে ক্যালশিয়াম (চুন) খেলেও প্রায় একই কাজ হতে পারে। এই উদ্দে ক্যালশিয়াম কার্বনেট খাওয়া যেতে পারে, যা দামে খুবই সস্তা। চুনাপাথ বা চকখড়ি গুঁড়ো করে নিলেও কাজ হতে পারে এবং এক গ্রাম করে খাওয়া যথেষ্ট। যারা সমুদ্রের ধারে থাকে তারা যদি দিনে একগ্লাস করে সমুদ্রে জল খায় তাহলেই যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিনের যোগান থাকতে পারে। সমুদ্রের জল যদি পরিমাণের দিক থেকে পাঁচগুণ বেশি মিষ্টিজলের সঙ্গে মিশি নেওয়া যায় তাহলে তা খেতেও খুব সুস্বাদু। যদি শহরের কাছের সমুদ্র হ তাহলে সমুদ্রের জল ফুটিয়ে খাওয়াই ভালো। যারা সমুদ্র থেকে দূ থাকে তাদের পক্ষে আয়োডিন পাবার সহজ কোনো উপায় নেই। তবে আয়োডিনের চেয়ে অনেক বেশি বিপদ হতে পারে স্ট্রনশিয়াম থেকে। এ-প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো যে তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত টিউবওয়েলের জলকে স্পর্শ করতে পারে না, যেমন পারে খোলা জলকে। বাড়িতে যদি টিউবওয়েল থাকে তাহলে তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিপাতের পরে তরিতরকারি টিউবওয়েলের জলে ধুয়ে নেওয়া সমীচীন।

আমি আশা করছি এই প্রবন্ধের পাঠকরা আমাকে অজস্র চিঠি লিখবেন। আমি কোনো চিঠিরই জবাব দেব না। ভারতে লক্ষ লক্ষ ডাক্তার ও রসায়নবিদ আছেন যাঁরা এই প্রবন্ধ থেকে উদ্ভূত সমস্ত প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত জবাব দিতে পারবেন। আমি শুধু পাঠকদের জানিয়ে রাখছি, যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলোর কথা আমি বললাম তা খুবই অসম্পূর্ণ। আর আমি মনে করি, আমেরিকান, সোভিয়েত, ব্রিটিশ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য (উল্লিখিত ক্রমানুসারে), তেজস্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে যতটুকু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব—জোট-বহির্ভূত দেশের জনসাধারণের জন্যে তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু আমি জানি, তাঁরা এমন কি নিজেদের দেশের জনসাধারণের জন্যেও এই ব্যবস্থাটুকু করতে রাজি হবেন না।

এই প্রবন্ধ পড়ার পরে অনেক পাঠক বিজ্ঞানীদের এই বলে গালাগালি দেবেন যে বিজ্ঞানীদের জন্যেই জীবন এতখানি বিপদগ্রস্ত হয়েছে। খুব স্পষ্টভাবে একটি কথা বলা যাক। বিজ্ঞান রোগ-নিবারণের ওষুধ আবিষ্কার করেছে এবং তার ফলে শত শত জীবন রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি শুরু হয় তাহলে প্রত্যেকেরই ভবিতব্য হচ্ছে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তায় জীবনহানি। কোনো কোনো দেশের গভর্নমেণ্টেরও তাই ইচ্ছে। জীবনরক্ষার চেয়ে জীবন-সংহারের দিকেই তাঁদের আগ্রহ বেশি। পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য যত টাকা খরচ করা হচ্ছে তার দশভাগের একভাগও যদি পাকিস্তানের বসন্তরোগ নির্মূল করার জন্যে ব্যয়িত হতো তাহলে সাম্প্রতিক বসন্তরোগটি মহামারি হয়ে দেখা দিত না এবং পাকিস্তানী প্রবাসীদের দ্বারা সংক্রমিত হয়ে কয়েক ডজন ইংরেজ রোগাক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাত না। গভর্নমেণ্ট যদি অসৎ হয় আর অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী যদি অসৎ গভর্নমেণ্টর সঙ্গে সহযোগিতা করে—তাহলে বিজ্ঞানীদের সেজন্যে দোষী করা চলে না।

তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত ও মানবজাতির বিপদ

রাধাকান্ত মণ্ডল

সারা পৃথিবীর মানুষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূল বিস্ফোরণ হয়ে চলেছে। এই সকল পরীক্ষায় কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত হবে, তার ব্যাপ্তি কতখানি হবে এবং সর্বোপরি এই তেজস্ক্রিয়তা থেকে মানুষে কি ধরনের ও কতটা ক্ষতি হবে তা নির্ণয় করবার মতো পর্যাপ্ত তথ্য বর্তমান বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। এই কারণেই জীববিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের আশংকা বেশি। ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করবার আগেই অপরিসীম ক্ষতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

তেজস্ক্রিয়তা

মূল বক্তব্যে আসার আগে তেজস্ক্রিয়তার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। আমরা জানি, কোনো মৌলিক পদার্থের পরমাণু ইলেকট্রন, নিউট্রন ও প্রোটন এই তিন রকম অন্তিম কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। নিউট্রন ও প্রোটনের সমবায়ে গঠিত ধন আধানযুক্ত 'নিউক্লিয়াস' বা কেন্দ্রীনের চারদিকে ঋণ আধানযুক্ত ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন কক্ষে ঘুরে বেড়ায়। একটি পরমাণুকে যদি আমরা সৌরজগতের সঙ্গে তুলনা করা যায়—তবে 'কেন্দ্র' হচ্ছে তার সূর্য আর ইলেকট্রনগুলি গ্রহ। কেন্দ্রস্থিত প্রোটনের সংখ্যা (যা বহিস্থ ইলেকট্রনের সংখ্যার সমান) দিয়েই মৌলিক পদার্থের ধর্ম স্থিরীকৃত হয়। কোনো উপায়ে এই সংখ্যার অদলবদল করতে পারলে একটি মৌলিক পদার্থ অন্য একটি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কেন্দ্রস্থিত প্রোটনের সংখ্যা খুব বেশি হলে বা প্রোটন ও নিউট্রনের সাম্য নষ্ট হলে পরমাণু অতিরিক্ত শক্তিযুক্ত ও অস্থায়ী হয়ে পড়ে। এইরূপ চঞ্চল পরমাণুকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় উত্তেজিত বা তেজস্ক্রিয় পরমাণু বলে। এইরকম উত্তেজিত পরমাণু তার অতিরিক্ত শক্তি ছেড়ে দিয়ে একটি স্থায়ী পরমাণুতে পরিণত হতে চায়। অস্থায়ী পরমাণু থেকে মুক্ত এই শক্তিই তেজস্ক্রিয়তা। রেডিয়াম

ইউরেনিয়াম প্রভৃতি মৌলিকের পরমাণু স্বাভাবিক ভাবেই উত্তেজিত। আবার কতকগুলি মৌলিকের কেন্দ্রীনকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন নিউট্রন, আলফা-কণিকা প্রভৃতি দিয়ে আঘাত করে তার প্রোটন-নিউট্রনের সংখ্যা অদলবদল করে উত্তেজিত করা যায়। কোবাল্ট-৬০, ফসফরাস-৩২ প্রভৃতি এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ। পরমাণু বোমার বেলায় ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম এবং হাইড্রোজেন বোমার বেলায় ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম পরমাণুর মধ্যে ভাঙন বা রূপান্তর একবার শুরু হলে তা শৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় (chain reaction) ক্রমাগত বেড়ে চলে যতক্ষণ ভাঙন-যোগ্য পদার্থ বা ইন্ধন থাকে এবং তার ফলে অমিত শক্তি মুক্ত হয়।

তেজস্ক্রিয় বিকীরণ তরঙ্গ বা কণিকা হিসাবে নির্গত হতে পারে। রঞ্জন-রশ্মি ও গামারশ্মি তরঙ্গ। এরা তাপ ও আলোকের মতোই তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ, তবে এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম—এক ইঞ্চির এককোটি ভাগেরও কম। বস্তু কণিকা হিসাবে তেজস্ক্রিয় নির্গত হয় প্রধানত ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ও আলফাকণা হিসাবে। ইলেকট্রন (বিকীরিত ইলেকট্রনকে বিটা-কণাও বলা হয়) ক্ষুদ্রতম কণা—এর ভর অতি সামান্য—হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় দুহাজার ভাগের একভাগ এবং একক পরিমাণ ঋণ আধানযুক্ত। প্রোটন এক ভর বিশিষ্ট ও একক পরিমাণ ধন আধানযুক্ত। নিউট্রন এক ভরবিশিষ্ট, কিন্তু আধানশূন্য, আর আলফাকণিকা চার ভর ও দুই একক ধন আধানযুক্ত। বিকীরিত তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যত কম হবে এবং কণিকার গতি যত বেশি হবে তত বেশি তাদের ক্ষমতা হবে জীবকোষ বা অন্য কোনো পদার্থ ভেদ করবার। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সব পরমাণু একসঙ্গে বিকীরণ ছেড়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে না। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকীরণের হার বা দ্রুতি বিভিন্ন। এই দ্রুতি মাপা হয় তাদের 'অর্ধজীবনকাল' দিয়ে। যে সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা কমে গিয়ে অর্ধেক হয়ে যায় ঐ সময়কে তার 'অর্ধজীবনকাল' বলে। যেমন ফসফরাস-৩২-এর অর্ধজীবনকাল চৌদ্দ দিন, আবার কার্বন-১৪-এর প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর। যে পদার্থের অর্ধজীবনকাল বেশি, তারা অনেক বেশিদিন ধরে তেজস্ক্রিয় থাকে বলে মানুষ ও অন্যান্য জীবের পক্ষে বেশি ক্ষতিকর।

তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত

পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণের সময় শৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় পরমাণুর ভাঙন ও রূপান্তরের ফলে অমিত তেজই শুধু নির্গত হয় না, এর ফলে প্রায় শতাধিক তেজস্ক্রিয় মৌলিক বা আইসোটোপও তৈরি হয়। এই সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থ মেঘপুঞ্জরূপে ব্যাঙের ছাতার আকারে উপরে ওঠে এবং বিভিন্ন সময়ে তা আবার 'তেজস্ক্রিয়ভস্মপাত' রূপে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। ভস্মপাতের ব্যাপ্তি এবং বিস্ফোরণ ও পৃথিবীর বুকে ফিরে আসার অন্তর্বর্তীকালীন সময় অনুসারে ভস্মপাতকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরেই স্থানীয়ভাবে যে ভস্মপাত হয় তাকে 'তাৎক্ষণিক' বা নিকটবর্তী ভস্মপাত বলা হয়। এটা তেজস্ক্রিয়তা তীব্রতার দিক থেকে খুব বেশি হলেও বিস্ফোরণ-স্থলের কয়েক মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেহেতু পারমাণবিক পরীক্ষা নির্জন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা সমুদ্রে করা হয় সেইজন্য এই ভস্মপাত মানুষকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারে না। দ্বিতীয় হচ্ছে মাধ্যমিক বা 'ট্রপোস্ফেরিক' ভস্মপাত যা বায়ুমণ্ডলের পাঁচ থেকে দশ বারো মাইল উঁচু স্তরে সঞ্চিত থাকে এবং কয়েক দিন থেকে কয়েক মাসের মধ্যে নেমে আসে। এই ভস্মপাতের কাল নির্ণীত হয় বিভিন্ন বায়ুস্রোতের মিশ্রণের দ্রুতি, তাদের গতিপ্রকৃতি, বৃষ্টিপাত হাওয়া প্রভৃতির উপরে। গত বৎসরে রাশিয়ার পরীক্ষার কয়েকমাসের মধ্যে গ্রেটব্রিটেন এবং স্ক্যাণ্ডিনেভীয় উপদ্বীপ অঞ্চলে এই ভস্মপাতের ফলে তেজস্ক্রিয়তা চারণভূমির ঘাসে এবং গোরুর দুধে সঞ্চারিত হয়েছিল। ভারতের আণবিক শক্তি সংস্থার প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় যে ভারতেও এই তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। গত এপ্রিলে খ্রীষ্টমাসদ্বীপে আমেরিকার পরীক্ষার পরে কলকাতার বৃষ্টিতে তেজস্ক্রিয়তা উল্লেখযোগ্যরকম বৃদ্ধি পায়। কলকাতার একটি বিখ্যাত গবেষণাগার এবিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও তথ্যসংগ্রহে ব্যাপৃত আছে। সবচেয়ে ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী ও বিলম্বিত 'স্ট্রাটোস্ফেরিক' ভস্মপাত অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণার আকারে ঊর্ধ্বে বায়ুস্তরে সঞ্চিত থাকে এবং ধীরে ধীরে কয়েকবছর ধরে সারা পৃথিবীতে নেমে আসে। অবশ্য এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক হ্রস্বজীবী আইসোটোপ তেজস্ক্রিয়তা হারিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এখন আন্দাজ করা হচ্ছে যে, বর্তমান পর্যায়ের রাশিয়ান বা আমেরিকান বিস্ফোরণের

ফলে উদ্ভূত এই তৃতীয়শ্রেণীর ভস্মপাত আগামী দশ থেকে পনের বছরের মধ্যে পৃথিবীতে নেমে আসবে।

তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতে যে সব আইসোটোপ থাকে তাদের মধ্যে মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক হচ্ছে প্রধানত ষ্ট্রনশিয়াম-৯০, আইয়োডিন-১৩১ এবং সিজিয়াম-১৩৭। রেডিয়োষ্ট্রন্‌শিয়াম বিটা-রশ্মি বিকীরণ করে এবং এর অর্ধজীবনকাল ২৮ বৎসর। তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম বিটা এবং গভীরে-প্রবেশক্ষম-গামারশ্মি বিকীরণকারী, অর্ধজীবন ২৭ বছর। তেজস্ক্রিয় আইয়োডিনও বিটা ও গামারশ্মি বিকীরণ করে, তবে এর অর্ধজীবনকাল মাত্র ৮ দিন।

মানুষ কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার সম্মুখীন

মানুষ সাধারণভাবে তিনধরনের উৎস থেকে তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হচ্ছে। প্রথমত ভূত্বকের শিলা-মৃত্তিকায় অবস্থিত স্বতঃ তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং বহির্বিশ্ব হতে আগত মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে—এই দুইয়ের সমষ্টি স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক তেজস্ক্রিয়তা। দ্বিতীয়ত চিকিৎসায় ব্যবহৃত এক্সরে, রেডিয়োথেরাপী প্রভৃতির জন্য তেজস্ক্রিয় বিকীরণ। তৃতীয়ত মনুষ্যসৃষ্ট পারমাণবিক চুল্লির অপচিত দ্রব্যাদি এবং সর্বোপরি পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত ভস্মপাত থেকে। এই সকল বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ স্থান বিশেষে এবং একই স্থানের ব্যক্তিবিশেষে এত বিভিন্ন যে একটা মোটামুটি পরিমাণ নির্ধারণ করাও প্রায় অসম্ভব। যেমন স্থানবিশেষে পারিপার্শ্বিক বিকীরণের অনেক তফাৎ। বৃষ্টিপাত, বায়ুস্রোত, বিস্ফোরণের স্থান থেকে দূরত্ব ইত্যাদির উপরে কোনো স্থানের ভস্মপাতজাত তেজস্ক্রিয়তা নির্ভর করবে। আবার একই স্থানের সকল ব্যক্তি একই প্রকার তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হবে না। বিশেষ করে ভস্মপাতের তেজস্ক্রিয়তার বেলায় এটা মনে রাখা দরকার। আরও বিশদভাবে এই ব্যাপারটা বোঝার জন্যে ভস্মপাতের তেজস্ক্রিয়তা বাইরে থেকে আমাদের প্রভাবিত করা ছাড়াও কিভাবে আমাদের দেহে সঞ্চারিত হতে পারে তা আলোচনা করা যাক। তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত কোনো স্থানে ব্যাপকভাবে হলে তা ঐ স্থানের শাকসব্জি, কৃষিজ দ্রব্য, গোমহিষাদির চারণভূমির ঘাসে সঞ্চারিত হবে। এর কতক অংশ ধূলিকণার আকারে ঘাসপাতার গায়ে লেগে থাকবে—ভালো করে ধুয়ে নিলে যার অনেক অংশই চলে যাবে। কিন্তু দ্রবণীয় অংশ বৃষ্টির জলে ধুয়ে মাটিতে প্রবেশ করবে এবং

তা উৎপন্ন ফসলের বা শাকসব্জির অভ্যন্তরে যেতে পারবে, ধুয়ে নিয়ে দূর করা যাবে না। তৃণভূমি থেকে দুধের মাধ্যমে এবং ছাগমেষাদির মাং মাধ্যমেও ঐ তেজস্ক্রিয়তা মানুষের দেহে আসতে পারে। সমুদ্রে পরীক্ষা ভস্মপাতের দরুণ তেজস্ক্রিয়তা প্রতি একক আয়তন জলে অত্যন্ত কম হলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীবের দেহে তা অনেকটা ঘনীভূত হতে পারে এই জীবগুলি আবার কতকগুলি মাছের প্রধান খাদ্য। আবার ঐ মা মানুষে খেতে পারে। এই ভাবে জলের তেজস্ক্রিয়তাও স্বাভাবিক খা শৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষের দেহে ঘনীভূত হতে পারে। দেখা গেছে পারমাণবিক পরীক্ষার অল্পদিনের মধ্যে 'নিকট ভস্মপাতের' জন্য পার্শ্ব অঞ্চলে গোদুগ্ধে তেজস্ক্রিয় আইয়োডিন (আইয়োডিন-১৩১)-এর পরি খুব বেড়ে যায়। মানব দেহে আইয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থিতে ঘনীভূত হ শিশুরা সাধারণত বেশি দুগ্ধপান করে বলে তাদের থাইরয়েডে ঐ আয়ো ঘনীভূত হয়ে তেজস্ক্রিয়তা বিপজ্জনক মাত্রায় পৌছতে পারে। ভস্মপা বর্তমান আর একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ ষ্ট্রনশিয়াম-৯০ অত্যন্ত দীর্ঘজীবী এ ক্যালসিয়ামের সঙ্গে এর গুণগত সাদৃশ্যের ফলে খাদ্যের ক্যালসিয়ামের সা সঙ্গে ষ্ট্রনশিয়াম-৯০ দেহে সঞ্চিত হয়। ক্যালসিয়াম শরীরের পক্ষে এ অবশ্যপ্রয়োজনীয় পদার্থ এবং সুষম ও পর্যাপ্ত খাদ্যে ক্যালসিয়াম প্রচুর থা বলে ষ্ট্রনশিয়াম-৯০ লঘু বা diluted হয়ে যায় ও সবটা শরীরে শোষিত হ না। দুধ তার ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধির জন্য এজন্য খুব উপকারী। গরীব লোকে দুধ বা ক্যালসিয়ামযুক্ত অন্য খাদ্য কম খেতে পায় বলে তারা ষ্ট্রনশিয়াম ঘটিত তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হবে বেশি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে—মানুষ কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার সম্মুখীন এটা ব খুব শক্ত। তবে, মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়া যেতে পারে—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশানাল রিসার্চ কাউন্সিলের 'বিকিরণের জৈবিক প্রভাব' সম্প বিবরণ থেকে। একজন আমেরিকানের প্রজননগ্রন্থিগুলিতে প্রাপ্ত (ঐ গ্রন্থিগুলিই সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল) ৩০ বছরের মিলিত তেজস্ক্রিয় মাত্রা গড়ে নিম্নরূপ : (১) পারিপার্শ্বিক বিকীরণ—৪.৩ রোন্‌জেন্ (রোন্‌জে হচ্ছে তেজস্ক্রিয় বিকীরণের মাত্রার একটি একক ; এই মাত্রা সম্বন্ধে ধার করার জন্য বলা যেতে পারে—একটি সাধারণ এক্স-রে যন্ত্র রোগীর দেহে চিকিৎসিত অংশে ৫ থেকে ৮ রোন্‌জেন্ বিকিরণ করে, কিন্তু দেহের অভ্যন্ত

দূরবর্তী অংশে—যেমন জননকোষগুলিতে—এই মাত্রার প্রায় হাজার ভাগের এক ভাগ পড়ে) (২) বিকিরণ চিকিৎসা, এক্স-রে প্রভৃতি থেকে—প্রায় ৩ রোন্‌জেন্ (আমাদের দেশে আরও কম), (৩) তেজস্ক্রিয়ভস্মপাতের দরুণ— ০.১ থেকে ০.৫ রোন্‌জেন্। এ হচ্ছে ১৯৫৬ সালের হিসাব। তার পরে সম্প্রতি কালের রাশিয়ান ও আমেরিকান পরীক্ষার ফলে শেষোক্ত মাত্রা দুই থেকে দশ গুণ বেড়ে গেছে। স্থানবিশেষে হয়তো আরও বেশি—কে জানে। কাজেই দেখা যাচ্ছে—যদিও ভস্মপাতের দরুণ তেজস্ক্রিয়তা এখনও আর দুই উৎস থেকে প্রাপ্ত মাত্রা থেকে কম—তবু যে হারে এই পরীক্ষা চলছে তাতে অদূর ভবিষ্যতেই এই মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া, এ বিষয়ে আরও একটা কথা বলার আছে। শান্তির জন্য বা চিকিৎসায় রোগমুক্তির জন্য বিশেষ একটি শুভফললাভের উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক মানুষ তেজস্ক্রিয়তার ঝুঁকি নেয়—তার একটা যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বের সকল মানুষের উপর যে পরিমাণই হোক না কেন— একটা অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয়তার ঝুঁকি চাপানোর কোনো যৌক্তিকতা বা অধিকার কারও নেই।

তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব

এখন মানুষের উপর তেজস্ক্রিয়তার ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। তেজস্ক্রিয়তা থেকে মানবজাতির সম্ভাব্য বিপদ প্রধানত তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত, তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের ব্যক্তিগত দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি। দ্বিতীয়ত, আক্রান্ত জনসমষ্টির ভবিষ্যৎ বংশধরদের এবং সমগ্রভাবে মানব সমাজের ক্ষতি। তৃতীয়ত, মানুষ যে পরিবেশে বাস করে এবং বেঁচে থাকে—অর্থাৎ তার চারপাশে প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ নিয়ে যে পরিবেশ—সেই সমগ্র জীবজগতের সাম্য ও স্থিতাবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানুষের ক্ষতি। এই সমস্যাগুলি এত ব্যাপক ও জটিল যে, কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তায় কতটা ক্ষতি হতে পারে তা নির্ণয় করা বেশির ভাগই এখনও অনুমানসাপেক্ষ।

তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত মানুষের দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে জানা গেছে প্রধানত জীবাণু, মাছি, ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি প্রাণীর উপরে পরীক্ষা থেকে। তা ছাড়া, সংশ্লিষ্ট বৃত্তিতে নিযুক্ত কিছু মানুষ, হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আক্রান্ত

মানুষের উপর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকেও অনেক কিছু জানা গেছে। মাত্রায় আক্রান্ত হলে মানুষ এবং যে কোনো জীবই মৃত্যুমুখে পতিত মারাত্মক মাত্রার নিচে বিভিন্ন পরিমাণের তেজস্ক্রিয়তায় স্বল্পায়ুতা, অকাল প্রজননশক্তির হ্রাস বা লোপ, ক্যানসার, রক্তের ক্যানসার বা লিউকি পোড়া, চর্মের কর্কশতা, চুল পড়ে যাওয়া, আভ্যন্তরীন রক্তমোক্ষন, গণ্ডগোল প্রভৃতি হতে পারে। এই সব লক্ষণের জন্য খুব অল্পসময়ে কয়েক রোন্‌জেন্ থেকে কয়েক শ রোন্‌জেন্ পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা দরকা এই সকল শারীরিক অসুস্থতার দিক থেকে একটি গুরুমাত্রা থেকে অনেক হালকা মাত্রায় কম ক্ষতি হয়। কারণ, তেজস্ক্রিয়তার ফলে সঞ্জাত অসুস্থ অনেকগুলি সাময়িক এবং নিরাময়যোগ্য। এই সব বিচার করে মানু জন্য একটি উর্ধ্বতম 'নিরাপদ মাত্রা' স্থির করা যেতে পারে।

তেজস্ক্রিয়তার পক্ষে সবচেয়ে সংবেদনশীল হচ্ছে প্রাণীদের প্রজনন-ব্য যে কোনো তেজস্ক্রিয় বিকীরণ প্রজননগ্রন্থিতে (স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয় বা পু অণ্ডকোষ) পৌছলে সেখানে অবস্থিত জিন বা বংশধারা নিয়ামকের পরি (Mutation) ঘটাতে পারে। এই পরিবর্তিত জিন আবার বংশ নিয়মানুসারে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। পরিব্যক্তির জন্য কো নিম্নতম মাত্রা নেই। যে কোনো পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা প্রজননকোষে পৌ কিছু পরিমাণ পরিব্যক্তি ঘটাবেই যার অধিকাংশই ক্ষতিকর। তাই অল্প তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত ব্যক্তির আপাতত কোনো ক্ষতি পরিলক্ষিত না হ পরিব্যক্তিজনিত ক্ষতি ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনেকের মধ্যে দেখা এই পরিব্যক্তি আঙ্গিক বা মানসিক বৈকল্য, জননক্ষমতার হ্রাস প্রভৃ প্রকাশ পেতে পারে। কোনো ক্ষতিকর পরিব্যক্তির ফল মনুষ্যসমাজ ততদিন দূরীভূত হবে না যতদিন সেই বংশধারা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ না পায়। প্রজননব্যবস্থার উপর তেজস্ক্রিয়তার এই অনিষ্টকর প্রভাব করে কোনো ব্যক্তির সারা জীবনে প্রাপ্ত মোট মাত্রার উপরে—বিশে পনের বছর বয়স থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত (যে সময়ের মধ্যে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু বেশি জন্মায়)—এই ত্রিশ বছরে প্রাপ্ত মোট মাত্রার উ এইজন্য এই সক্রিয় প্রজননশীল ত্রিশ বৎসরই পূর্বে লিখিত ন্যাশন্যাল কাউন্সিলের হিসাবে ধরা হয়েছে।

তেজস্ক্রিয়তা-ঘটিত পরিব্যক্তি সম্বন্ধে সঠিক জানা না থাকলেও

উপর কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তায় কতটা পরিব্যক্তি হতে পারে তার সম্বন্ধে ধারণা করার চেষ্টা হয়েছে। এর জন্য একটি মাত্রা ধরা হয়েছে যার নাম 'দ্বিগুণকারী মাত্রা'—অর্থাৎ যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার মাত্রায় সমগ্রভাবে মানবজাতির পরিব্যক্তি স্বাভাবিক পরিব্যক্তির দ্বিগুণ হবে। মোটামুটিভাবে এই মাত্রা হচ্ছে ৩০ থেকে ৫০ রোন্‌জেন্। এখানে মুশকিল হচ্ছে—বিশ্বের জনসংখ্যার মধ্যে স্বাভাবিক পরিব্যক্তির হার কিরূপ তাও সঠিক জানা নেই। রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈজ্ঞানিক কমিটি এবং ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের হিসাব থেকে এ সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা যেতে পারে মাত্র। বর্তমানে আমেরিকার শিশুদের দুইশতাংশ কোনো না কোনো প্রকার জন্মগত বৈকল্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ৩০ থেকে ৪০ রোন্‌জেন্ তেজস্ক্রিয়তায় প্রত্যেক আমেরিকান যদি আক্রান্ত হয় তবে এই হার হবে দ্বিগুণ অর্থাৎ চার শতাংশ। রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈজ্ঞানিক কমিটির মতে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ যদি ১৯৫৮ সালে বন্ধ হতো তবে পরের কয়েক পুরুষ ধরে আড়াই হাজার থেকে এক লাখ শিশু জন্মগত বৈকল্য নিয়ে জন্মাত। তার উপরে পঁচিশ হাজার থেকে দেড়লাখ লোক ভুগত লিউকিমিয়ায়। ১৯৫৮ সালের পরে বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ আজ এই বিপদের মাত্রাও দ্বিগুণ। এ থেকে মোটামুটি বিপদের ভয়াবহতা ও গুরুত্ব বোঝা যায়।

মানবজাতির মঙ্গল অমঙ্গল তার পরিবেশের উপরও নির্ভরশীল। পৃথিবীতে মানুষ অন্যজীব-নিরপেক্ষ হয়ে বাঁচতে পারে না। গাছপালা, পশুপাখি—এরাই আমাদের খাদ্যের যোগান দেয়। কতকগুলি কীটপতঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের খাদ্যসরবরাহ না করলেও তারা হয়তো অন্য প্রাণীর খাদ্য, যারা আবার আমাদের খাদ্য। শিয়াল প্রভৃতি জন্তু, কাক, শকুন প্রভৃতি প্রাণী নোংরা জিনিষ খেয়ে আমাদের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে। যেহেতু তেজস্ক্রিয়তার ফলাফল সব জীবের উপর সমান নয়, সেইজন্য এর ফলে আমাদের ও আমাদের চারপাশের জীবজগতের স্বাভাবিক সাম্য (Natural Ecology) নষ্ট হলে যথেষ্ট ক্ষতি হবে। অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয়তার ফলে অন্তত আঞ্চলিক ভাবে ক্ষতিকর ও অবাঞ্ছিত পরিব্যক্তি বেশি হবে যার ফলে কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যেতে পারে, অপেক্ষাকৃত তেজস্ক্রিয়তা-সহিষ্ণু আগাছা ও কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। তা ছাড়া এক বা ততোধিক প্রজাতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলে বর্তমান স্বাভাবিক খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যেও ভাঙন আসতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে,

আমাদের মঙ্গলের জন্য শুধু মানুষকেই তেজস্ক্রিয়তার বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারলেই যথেষ্ট হবে না, অন্যান্য জীবকেও রক্ষা করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও তজ্জনিত তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত সারা বিশ্বের পক্ষে এক অভিশাপ ডেকে আনতে চলেছে। সভ্যতার চরম শিখরে উন্নীত বিংশ শতাব্দীর মানুষ আজ যেন নিজেই নিজের হাতে গড়া সভ্যতা বিলুপ্ত করে দিতে চাচ্ছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের দানবশক্তিতে শ্রেষ্ঠ হবার সদম্ভ প্রচেষ্টায় বিশ্বের কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষের জীবনের কোনো মূল্যই স্বীকার করা হচ্ছে না। এই মারণযজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়ার আগেই সারা পৃথিবীর মানুষকে একযোগে প্রতিবাদ জানাতে হবে—দাবি জানাতে হবে পারমাণবিক অস্ত্র বর্জনের এবং সামগ্রিক ভাবে নিরস্ত্রীকরণের। কারণ পৃথিবীর কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষই যুদ্ধ চায় না, চায় শান্তি।

পরমাণু ও পারমাণবিক শক্তি

শঙ্কর চক্রবর্তী

বিচিত্র বস্তুর সমবায়ে আমাদের এই পৃথিবী ও বিরাট বিশ্বজগৎ গড়ে উঠেছে। বস্তুর তিন রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয়—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। এর যে কোনো একটা রূপে বস্তুকে ক্রমাগত ভেঙ্গে চললে যে সর্বক্ষুদ্র অবস্থায় পৌঁছনো যায়, তার নাম অণু বা molecule। বিভিন্ন পদার্থের অণু আবার নানা পরমাণু বা atom-এর সমবায়ে তৈরি। এ্যাটম একটি গ্রীক কথা, অর্থ হলো অবিভাজ্য, কিন্তু পরমাণু যে বিভাজ্য হতে পারে, তার সহস্র প্রমাণ বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। পরমাণুরা এত ক্ষুদ্র যে অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও এদের দেখার উপায় নেই।

বস্তুরহস্য

সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের পরমাণুর অন্দরমহলে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, এর একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে একটি প্রোটন ও সেই কেন্দ্রীনের চারপাশে একটি কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটিমাত্র ইলেকট্রন। সবচেয়ে ভারি মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনে আছে ৯২টি প্রোটন ও একাধিক বহির্কক্ষে আবর্তিত হচ্ছে ৯২টি ইলেকট্রন। প্রোটন হলো পজিটিভ বা ধনবিদ্যুৎসম্পন্ন বস্তুকণা এবং ইলেকট্রন হলো নেগেটিভ বা ঋণবিদ্যুৎসম্পন্ন বস্তুকণা ও এই দুটি বিদ্যুৎশক্তি পরস্পর সমান। যে কোনো মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রীনে যতগুলো প্রোটন থাকে, কেন্দ্রীনের বহির্কক্ষেও ততগুলো ঋণাত্মক ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায়—যে কারণে পরমাণুর বৈদ্যুতিক সমতা রক্ষা পেয়ে থাকে। প্রোটনের সংখ্যার ওপরে আবার পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে থাকে।

ইলেকট্রনের ভর বা mass প্রোটনের ভরের দু-হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। একটি পরমাণুর ভর হওয়া উচিত তার মোট প্রোটন ও ইলেকট্রনের ভরের যোগফলের সমান। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল, বিভিন্ন পরমাণুর ভর তার চেয়ে অনেক বেশি দাঁড়াচ্ছে। এই বাড়তি ভরটুকু এলো কোথা থেকে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানী চ্যাডউইক ১৯৩২ সালে পরমা কেন্দ্রীনে নিউট্রন নামে একটি নতুন বস্তুকণিকা আবিষ্কার করে বস একটি জটিল সমস্যার সমাধান হওয়ায় বিজ্ঞানীরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে দেখা গেল, নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের প্রায় সমান, কিন্তু তার মধ্যে কো তড়িৎধর্মের সন্ধান পাওয়া গেল না। ইলেকট্রনের ভর তুলনায় খুব ক বলেই পরমাণুর কেন্দ্রীনের প্রোটন ও নিউট্রনের ভরের সমষ্টিকেই 'পারমাণবি ভর' বলা হয়ে থাকে। একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের মিলনেই এ নিউট্রনের জন্ম। বিদ্যুৎ ব্যাপারে উদাসীন এই বস্তুকণাটি পরমাণুকেন্দ্রী বাঁধন থেকে মুক্ত হলেই ভোল পালটে একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্র একটি নিউট্রিনোর জন্ম দিয়ে বসে। নিউট্রিনো একটি সম্পূর্ণ নতুন বস্তুক এর কোনো বিদ্যুৎধর্ম নেই ও ভরও অতি সামান্য। পরমাণুকেন্দ্রীন সং কতগুলো ভারি জটিল সমস্যার সমাধানে এটি বিজ্ঞানীদের হাতে খুব কার্য হয়ে উঠেছে।

দেখা দিল আরো বড় সমস্যা। পরমাণুকেন্দ্রীন জায়গাটা এত ছোট তার কোনো ধারণাই করা যায় না। যে দূরত্ব নিয়ে এখানকার কারবার পরিমাণ হলো এক মাইক্রনের একশকোটি ভাগের একভাগ—আর মাইক্রন মাপ হলো মিলিমিটারের হাজার ভাগের মাত্র একভাগ। তাহলে অত ছো জায়গার মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রনেরা গাদাগাদি করে রয়েছেই বা কি ক ইউরেনিয়াম-২৩৮ এর (ইউরেনিয়ামের একটি আইসোটোপ বা জুড়িদার, যা কথা পরে আসবে) কথাই ধরা যাক, যার পরমাণুর কেন্দ্রীনে বাসা বেঁধে আ ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি নিউট্রন। প্রোটনেরা ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা। ধনা বিদ্যুৎকণারা সবসময়েই পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে এবং ফলে পরমাণুকেন্দ্রীন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবার কথা। তাহলে কোন শক্তির শাসনে এই চিরবি প্রোটনের দল ভালোমানুষের মতো পরমাণুর কেন্দ্রীনে শান্তিরক্ষা করে চলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, দুটি সমধর্মী বস্তুকণার পারস্পরিক দূরত্ব যখন অ স্বল্প হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের স্বাভাবিক বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে এক প্র আকর্ষণশক্তি কার্যকরী হয়ে ওঠে—তারা নিজেদের মধ্যে বাঁধা পড়ে যায়। শক্তিকে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন আদানপ্রদানের শক্তি (exchange force দুটি প্রোটনের মধ্যেকার বিকর্ষণশক্তির তুলনায় যা কোটি কোটি গুণ বলশালী এই শক্তিই যেন সিমেন্টের মতো বস্তুজগতকে একত্রিত করে রেখেছে।

ইউকাওয়া নামে এক জাপানী বিজ্ঞানী 'মেসন' নামে আর একটি নতুন বস্তুকণার আবিষ্কার করলেন। তাঁর মতে এই মেসনও পরমাণুকেন্দ্রীনকে আঠার মতো জুড়ে থাকতে সাহায্য করে। এর ভর ইলেকট্রন ও প্রোটনের ভরের মাঝামাঝি। মহাকাশের গহন অভ্যন্তর থেকে যে মহাজাগতিক রশ্মি আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌছয়, তার মধ্যেই এই মেসনের সন্ধান প্রথম পাওয়া গিয়েছিল।

বিজ্ঞানী এ্যাণ্ডারসন গবেষণাকালীন অবস্থায় আর একটি বস্তুকণা আবিষ্কার করে বসলেন, যার ভর ও অন্যান্য গুণাগুণ সমস্তই ইলেকট্রনের মতো কিন্তু বিদ্যুৎধর্মের প্রকৃতি ধনাত্মক। ইলেকট্রনের এই বিপরীত-বস্তুকণাটির নাম দেওয়া হলো পজিট্রন। আধুনিককালে বস্তুকণার গতিবর্ধক যন্ত্র সাইক্লোট্রন, বিটাট্রন, প্রোটন-সিনক্রোট্রন, বিভাট্রন ইত্যাদির অভ্যন্তরে এ্যান্টি-প্রোটন (প্রোটনের সমগ্র গুণবিশিষ্ট, শুধু ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী) ও এ্যান্টি-নিউট্রন (নিউট্রনের সমগ্র গুণবিশিষ্ট, শুধু স্পিন বা আপন মেরুদণ্ডের ওপর আবর্তনের ধরনটা বিপরীত) ইত্যাদি আরো কয়েকটি বিপরীত-বস্তুকণা ও অনেকগুলি নতুন বস্তুকণার আবিষ্কারের ফলে পরমাণুকেন্দ্রীনের নানা রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে চলেছে।

বস্তু ও শক্তি

কল্পনাতীত ক্ষুদ্র পরমাণুর মোট চেহারার তুলনায় তার কেন্দ্রীনের মাপটা আবার এত ছোট যে সমস্ত পরমাণুটাকে একটা ফাঁকা জায়গা বললেও মোটেই ভুল হবে না। অথচ কি অনন্ত রহস্য তার অন্তঃপুরে। এও যেন মহাকাশেরই দোসর। বিরাটত্বে একটি যেমন অনন্ত, অসীম ক্ষুদ্রতার বিচারে অন্যটিও ঠিক তাই। পরমাণুর মধ্যেই বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন আলাদিনের দৈত্যের শক্তিকে। বস্তুকে ধ্বংস করে শক্তিতে রূপ দেওয়া যায়, আবার শক্তিকে রূপ দেওয়া যায় বস্তুতে, মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে একটি ঐতিহাসিক আঙ্কিক সূত্রের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের ওপর পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ঘটনায় বস্তুর শক্তিতে রূপান্তরের সর্বনাশা প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হলো বিশ্ববাসীর। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাল, সভ্যতার অপরিমেয় সম্পদের কত চিহ্ন মুছে গেল ওই জনপদ দুটি থেকে।

অপরাধী ছিল কে—পরমাণু? বর্তমানে মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রতি... হিরোশিমা-বোমার চেয়েও সহস্রগুণ বেশি শক্তিশালী হাইড্রোজেন বো... তৈরি করেছে। মধ্যযুগে আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কারের পর থেকে আজ পর্য... মানুষ তার সমগ্র যুদ্ধের ইতিহাসে যত আগ্নেয়বোমা ব্যবহার করেছে, তা... চেয়েও প্রায় তিনগুণ বেশি শক্তিধারণ করে একটি আধুনিক হাইড্রোজে... বোমা। এ জাতীয় একটি বোমার বিস্ফোরণে লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্... কলকাতার মতো বিপুল জনবহুল শহরের বুক থেকে শুধু যে সমগ্র প্রাণীজগ... গাছপালা বা ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তাই নয়, আশেপাশে পঞ্চা... মাইলের মতো এলাকার বারোআনা অংশ সর্বাত্মক ধ্বংসের শিকারে পরিণ... হবে।

আগুন আবিষ্কার করে একদিকে মানুষ যেমন তার সভ্যতাকে গ... তুলেছে, তেমনি তাকে পুড়িয়ে ছারখারও করেছে। দোষটা আগুনের নি... না। পরমাণুর বিপুল ধ্বংসের চেহারাটাই তার সত্য পরিচয় নয়। ... অপরিমেয় শক্তির উৎস সেই পরমাণুর মধ্যে লুকিয়ে আছে, তার কল্যাণ... রূপটাই বড়—যে রূপের সঙ্গে বাস্তব পরিচয় গ্রহণে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী... অগ্রণী হয়েছেন। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের ভিত্তিতে ১৯৫৫ সা... সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা শহরে যে মহতী বিশ্ববিজ্ঞান সম্মেলন হয়েছিল, ... সম্মেলনে পৃথিবীর ৭২টি দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম ভাববিনিময়ের প... সুযোগ পেলেন—সেখানেই রাখীবন্ধন হলো মানুষের শুভবুদ্ধির সঙ্গে পরমা... অপরিমেয় শক্তিভাণ্ডারের। সেই সম্মেলনের বাণী আজও বিজ্ঞানী... প্রেরণাস্থল হয়ে আছে—সমস্ত অকল্যাণের ওপর যে একদিন প্রতিষ্ঠা ল... করবেই। আমরা অত্যন্ত গর্বিত, আমাদের ভারতেরই বিজ্ঞানী হোমী ভা... সেই বিশ্ববিজ্ঞান সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ওপর বিজ্ঞানীরা কেন এতখা... গুরুত্ব আরোপ করছেন, তার বিশেষ কারণ রয়েছে। কয়লা এবং খনিজ তেল... পেট্রোলিয়াম—এই দুটি জ্বালানি হলো পৃথিবীর শক্তিব্যবস্থার প্রধান উপাদা... ভূগর্ভে এদের মোট পরিমাণের একটা মোটামুটি হিসেব করে দেখা গে... পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান শিল্পব্যবস্থার চাহিদা মেটাতে এই সঞ্চয় আনুমানিক ... বছরের মধ্যে প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়বে। অতএব, বিকল্প শক্তিব্যবস্থার ক... এখন থেকেই বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়। পারমাণবিক বোমার সর্ব...

ধ্বংসক্ষমতার প্রথম পরিচয় বিজ্ঞানীদের মনে যে বিরাট প্রশ্নের ঝড় তুলেছিল। তার উত্তর খুঁজে পাওয়ার ওপরেই নির্ভর করছিল মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ। শক্তিসৃষ্টির নতুন অনুসন্ধানপর্বের প্রধান নায়ক হয়ে দাঁড়াল—পরমাণু।

বস্তু ও শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের একটা ছোট্ট হিসেব নেওয়া যাক। এক কিলোগ্রাম (এক হাজার গ্রাম, প্রায় এক সের দেড় ছটাক) ওজনের কয়লাকে জ্বালিয়ে ৮⅓ কিলোওয়াট-ঘণ্টার মতো শক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই শক্তি দিয়ে এক হাজার ওয়াট শক্তিসম্পন্ন আটটি ও পাঁচশ ওয়াটের একটি বৈদ্যুতিক বাতিকে একঘণ্টা জ্বালিয়ে রাখা যাবে। এ হলো কয়লা ও অক্সিজেনের পারস্পরিক দহনজাত রাসায়নিক উপায়ে পাওয়া শক্তি। কিন্তু এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়ামকে যদি সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে তার পরিমাণ দাঁড়াবে আড়াই হাজার কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টার সমান। অর্থাৎ এই শক্তির সাহায্যে এক হাজার ওয়াট শক্তিসম্পন্ন আড়াই হাজার কোটি বাতিকে এক ঘণ্টা জ্বালিয়ে রাখা যাবে। একটা হিসেব করে দেখা হয়েছিল, এই বিপুল শক্তির দ্বারা ১৯৩৯ সালের গোটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র শিল্পব্যবস্থার পুরো দুমাসের বৈদ্যুতিক চাহিদা মেটানো যেত। এক কিলোগ্রাম বস্তুর সমগ্র পরমাণু শক্তিতে রূপান্তরিত হলেই এই অকল্পনীয় ঘটনাটি ঘটতে পারে। তাহলে কেউ যদি বলেন, মাথার একটা চুলকে ছিঁড়ে নিয়ে তাকে একই ভাবে শক্তিতে পালটে দিলে একটা মোটর গাড়ি পুরো একবছর নিশ্চয়ই চালু থাকতে পারে—তার কথাটাকে মোটেই বিদ্রূপ করা যায় না। অবশ্য সব বস্তু থেকে এভাবে শক্তি পাওয়া যাবে না। যাদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে, তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বস্তুজগতে কৌলিন্যে তাদের আসন সকলের ওপরে। শক্তির এ রূপটা হলো পারমাণবিক। আর এর চেহারাটা যে কত বড়, রাসায়নিক ও পারমাণবিক শক্তির পাশাপাশি তুলনাতেই তা ধরা পড়ে। এই শক্তির চাবিকাঠি পরমাণুর প্রতি বিজ্ঞানীরা কেন যে এতটা প্রলুব্ধ হয়েছেন, তা সহজেই বোঝা যায়।

পারমাণবিক শক্তি

পৃথিবীর মানুষের কাছে পারমাণবিক শক্তি ব্যাপারটা নতুন হলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে সে ছবিটা অনেকদিনের পুরনো। নক্ষত্র সূর্যের কথাটাই ধরা যাক।

কোটি কোটি বছর ধরে সূর্য আলো এবং তাপের বিপুল পরিমাণ এক শ… ছড়িয়ে চলেছে। সে শক্তির স্পর্শ ছাড়া পৃথিবীর আকাশ, মাটি … এলাকা জুড়ে এত বিচিত্র প্রাণীজগতের সৃষ্টি কখনোই হতে পারত না। … শক্তির যে উৎস—তার আসল চেহারাটা কি রকম। বিজ্ঞানের কথায় … গেলে সে হলো এক পারমাণবিক কড়াই—যেখানে প্রচণ্ড তাপের ঠেলায় (… কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) হালকা হাইড্রোজেন পরমাণুরা মিলে চারগুণ … ভারি হিলিয়ামের পরমাণুদের গড়ে চলেছে অবিশ্রান্তভাবে। পদার্থের এই … পালটানোর সময় হাইড্রোজেনের খানিকটা করে ভর খোয়া যাচ্ছে। … সমগ্র দেহে পদার্থের দৈনিক লোকসানের পরিমাণটা হলো ৩০০০০ কোটি … এই গঠন প্রক্রিয়ার ফলে প্রতিমুহূর্তেই বিকিরিত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ … যার খুব সামান্য অংশ পৃথিবীতে পৌছয়, বাকিটা মহাকাশে ছড়িয়ে … সূর্যের হাইড্রোজেনের ভাণ্ডারে এই বিপুল ঘাটতির অঙ্কটায় কেউ … আতঙ্কিত না হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানীদের হিসেব মতো সূর্যের সমগ্র জন্ম… তার মোট সঞ্চয়ের শতকরা বড় জোর এক ভাগ হাইড্রোজেন ফুরিয়ে থা… তার বেশি নয়।

আমাদের প্রয়োজন পারমাণবিক শক্তি ও সেই শক্তির উৎস হলো পদা… পরমাণুকেন্দ্র। সে শক্তিলাভের উপায় আমাদের জানা আছে। তা … পরমাণুকেন্দ্রের ধ্বংসসাধন। বস্তু ধ্বংস করে পেলাম শক্তি। তার মানে … এই নয় যে বস্তুটারই দেহ বা কাঠামো আছে, আর শক্তিটা হলো প্রেত, বি… আত্মা। শক্তিরও ওজন আছে, চাপ আছে। একটা বিশেষ শক্তির … রশ্মিকে সীসের মতো গুরুভার পদার্থের ওপর ছুঁড়ে মারলে তা থেকে … বিদ্যুৎকণা—ইলেকট্রন ও পজিট্রন জন্মলাভ করে বসে। শক্তি থেকে … সৃষ্টির নমুনা পেলাম। তাহলে একথা যদি কেউ বলেন, যা ছিলনা … পেলাম, যেমন বস্তু থেকে শক্তি, আবার কিছুনা থেকে কিছু পেয়ে … যেমন গামারশ্মি থেকে বস্তুকণা, তাহলে ভুল বলা হবে। বরং একথাটা … বিজ্ঞানসম্মত হবে—বস্তুর মধ্যে লুপ্ত হয়ে ছিল যে তেজ, তাই ছাড়া পেল … রশ্মির মধ্যে যে বস্তুসম্ভাবনা ছিল তাই ফুটে বেরোল। এভাবে পদা… শক্তির যে নিত্যতা, তা রক্ষিত হচ্ছে। পৃথিবীতে বস্তু ভেঙ্গে গিয়ে ক্রমেই শ… পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে না, বা শক্তি ভোল পালটে বস্তুর পরিমাণটা বা… তুলছে না।

স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা

রুশবিজ্ঞানী মেন্দেলিয়েভ তাঁর পর্যায়িক ছকে (Periodic table) হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত পৃথিবীর ৯২টি মৌলিক পদার্থকে এমন সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন, যাতে তাদের ক্রমিক নম্বর পরমাণু কেন্দ্রীনের তড়িৎ-চার্জের সমান থাকে। ঐ ছকে এক নম্বর উপাদান হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীনে আছে একটি প্রোটন, কাজেই কেন্দ্রীনের তড়িৎ-চার্জ হলো এক। ৯২ নম্বর উপাদান হলো ইউরেনিয়াম, তার কেন্দ্রীনে আছে ৯২টি প্রোটন, কাজেই এক্ষেত্রে কেন্দ্রীনের তড়িৎ-চার্জ হলো ৯২। বর্তমানে মৌলিক পদার্থদের রাজ্যে আরো তেরটি নতুন সদস্য যুক্ত হয়েছে। এদের অবশ্য প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, এরা জন্ম পেয়েছে বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে ও বেশির ভাগই খুব স্বল্পস্থায়ী। মৌলিক পদার্থের সংখ্যা তাহলে বর্তমানে দাঁড়াল ১০৫টি।

পর্যায়িক ছকের একেবারে শেষে যাদের জায়গা—যেমন রেডিয়াম, য়্যাকটিনিয়াম, থোরিয়াম, প্রোটোয়্যাকটিনিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেখা গেল যে এদের সংসারের চেহারাটা মোটেই স্থায়ী নয়। আধুনিক পারমাণবিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল সেই ১৮৯৬ সালে, যেদিন ফরাসী বিজ্ঞানী বেকেরেল ইউরেনিয়াম ধাতুর স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় ক্ষমতাকে আবিষ্কার করলেন। দেখা গেল এই বস্তুটি ক্রমাগত নিজেকে খুইয়ে চলেছে আলফা (হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীন), বিটা (ইলেকট্রনকণা) ও গামা রশ্মির আকারে। ক্ষয় পেতে পেতে ইউরেনিয়াম ধীরে ধীরে পর্যায়িক ছকের ৮২নং উপাদান সীসায় পরিণত হচ্ছে, কিন্তু এ ক্ষয়ক্রিয়া এত ধীরগতি যে আজ থেকে সাড়ে চারশ কোটি বছর পরেও পৃথিবীর ইউরেনিয়াম-সঞ্চয় মাত্র অর্ধেক নিঃশেষিত হবে।

বেকেরেলের কিছুদিন পরে পিয়ের ও মাদাম কুরী সুদীর্ঘ সন্ধানে আবিষ্কার করলেন রেডিয়ামের। ইউরেনিয়ামের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে এই রেডিয়াম, কিন্তু এর তেজস্ক্রিয় ক্ষমতা ইউরেনিয়ামের চেয়ে দশ লক্ষগুণ বেশি।

প্রকৃতির রাজ্যে এ এক বিচিত্র রহস্য। অকারণে কতকগুলো বস্তু যেন প্রায়োপবেশনে বসে কৃশাঙ্গ হবার ব্রত নিয়েছে। মোটামুটিভাবে একটা সিদ্ধান্তে এভাবে পৌছনো সম্ভব হলো—যে বস্তুর পরমাণুর কেন্দ্রীনে বেশি সংখ্যায় নিউট্রন রয়েছে তাদের ভাগ্যে নিজেদের এভাবে ভেঙে বিলিয়ে দেওয়া

ছাড়া অন্য পথ নেই। পর্যায়িক ছকের শেষ পাঁচটি সদস্যের পরমাণুর কেন্দ্রী
নিউট্রন সংখ্যা হলো যথাক্রমে ১৩৮, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৩ ও ১৫০।

ইউরেনিয়াম ও জুড়িদার

বস্তুর স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা থেকে পাওয়া শক্তির পরিমাণ এত সামান্য
ধীরগতি যে আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। পদার্থ
পরমাণুকেন্দ্রীনের ভাঙনকে আরো দ্রুতগতি করে তুলতে হবে এবং সে
কৃত্রিমভাবেই সম্ভব।

পরীক্ষার বস্তুরূপে ইউরেনিয়ামকেই কেন বিশেষভাবে নির্বাচন করে নেওয়া
হলো আলোচনার মধ্য দিয়ে তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সাধারণ ইউরেনিয়াম
মধ্যে তিনটি আইসোটোপ বা জুড়িদার রয়েছে—ইউ-২৩৮, ইউ-২৩৫
ইউ-২৩৪। প্রতিটি জুড়িদারের পরমাণুর কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যা হলো ৯২
কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা হলো যথাক্রমে ১৪৬টি, ১৪৩টি ও ১৪২টি। প্রোটন
নিউট্রনের সংখ্যা যোগ করে গেলেই প্রতিটি জুড়িদারের ঘরের চেহারা মি
যাবে।

আইসোটোপের আইসস্ মানে হলো সমান আর টোপ্স্ মানে হলো স্থান
তাহলে কথাটির অর্থ দাঁড়াল—যারা সমান বা একই স্থান অধিকার করে থাকে
বা জুড়িদার। সব মৌলিক পদার্থেরই এমনি জুড়িদার আছে। রাসায়নিক
গুণাগুণের বিচারে মূল পদার্থের সঙ্গে তাদের জুড়িদারদের কোনো হেরফের খুঁ
পাওয়া যাবে না। তাহলে দুয়ের মধ্যে তফাতটা কোথায়? দুয়ের পরমাণু
ভরের মাপ কষতে গিয়ে সে তফাতটা বেরিয়ে পড়ল।

সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের কথাই ধরা যাক
হাইড্রোজেনের পরমাণুর কেন্দ্রীনে আছে একটিমাত্র প্রোটন ও সেই প্রোটনের
চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটিমাত্র ইলেকট্রন। অনুসন্ধানে একটি নতুন পদার্থ
পাওয়া গেল, যার রাসায়নিক গুণাবলী সাধারণ হাইড্রোজেনের মতোই কিন্তু
ওজনে তুলনায় দুগুণ বেশি ভারি। এর নাম দেওয়া হয়েছে ডয়টেরিয়াম বা
ভারি হাইড্রোজেন। ইনি হঠাৎ এমনধারা ভারিই বা হলেন কেন? দেখা
গেল এর পরমাণুর কেন্দ্রীনে একটি উদাসীন নিউট্রন ঢুকে বসে আছে।
কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটিই মাত্র ইলেকট্রন। তড়িৎ
নিউট্রনকে পেয়ে 'পারমাণবিক ভর' দুগুণ হলো বটে, কিন্তু, কেন্দ্রীনের তড়িৎ

চার্জে কোনো উনিশ-বিশ না হওয়ায় ডয়টেরিয়াম পরমাণুটির রাসায়নিক গুণাগুণ যেমন ছিল তেমনই রইল। অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে এও সাধারণ হাইড্রোজেনের মতোই জলের অণু গঠন করবে। তাকে বলা হবে ভারি জল (Heavy water)। পাঁচ-ছ হাজার বালতি সাধারণ জলের সঙ্গে প্রায় এক বালতি ভারি জল মিশে থাকে।

সাধারণ ইউরেনিয়াম ধাতুর শতকরা ৯৯.৩ ভাগ হলো ইউ-২৩৮, বাকি প্রায় .৭ ভাগ হলো ইউ-২৩৫। ইউ-২৩৪-এর পরিমাণ অতি নগণ্য—তাই একে হিসেব থেকে বাদ দিয়েই ধরা হয়। ইউ-২৩৮ ও ইউ-২৩৫, এই দুটি জুড়িদারকে কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করার উপায় নেই। অথচ সে পন্থাটি উদ্ভাবন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ একমাত্র ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীনকেই কৃত্রিমভাবে ভেঙে ফেলা সম্ভব। ইউ-২৩৮-এর পরমাণু-কেন্দ্রীনের বেলায় এই ভাঙার কাজটি ঘটার কিন্তু কোনো সম্ভাবনাই নেই। অন্য সব মৌলিক পদার্থকে বাদ দিয়ে ইউরেনিয়ামকে কেন বেছে নেওয়া হয়েছিল, এতক্ষণে বোঝা গেল। অন্তঃপুরে রয়েছে সোনার কাঠি—জুড়িদার ইউ-২৩৫। বস্তু ভেঙে শক্তি—এই রূপান্তরের সম্ভাবনায় যে উজ্জ্বল।

হাতিয়ার নিউট্রন

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্যে তা হলে যে পদার্থটি আমাদের দরকার, সেটি হলো ইউরেনিয়াম ধাতুর জুড়িদার ইউ-২৩৫। এর পরমাণুর কেন্দ্রীনে ভাঙন ঘটানোর জন্যে হাতিয়ার চাই। সেই হাতিয়ার বা বুলেটের কাজ যে করবে, সে হলো নিউট্রন। হঠাৎ নিউট্রনকে এ কাজের জন্যে বেছে নেওয়া হলো কেন? কারণটা অনুধাবন করা মোটেই শক্ত নয়। নিউট্রন বিদ্যুৎব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন বস্তুকণা। ইউ-২৩৫ পরমাণুর কেন্দ্রীনের চারদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে চলেছে ইলেকট্রনরূপ মেঘের আবর্তন। ঋণাত্মক বস্তুকণাদের এই রক্ষীব্যূহের মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করতে নিউট্রনকে কোনো বেগই পেতে হবে না। পরমাণুকেন্দ্রীনকে জুতসইভাবে ঘা মারতেও নিউট্রনের অসুবিধেটা তাই কম। কেউ ভাবতে পারেন ঘা-টা যত জোরে পড়বে, ততই ভালো। আসলে কিন্তু দেখা গেছে, দ্রুতগতি নিউট্রনের চেয়ে ধীরগতি নিউট্রনে কাজ হয় অনেক বেশি।

একটা ধীরগতি নিউট্রন দিয়ে পরমাণুকেন্দ্রীনকে আঘাত করলে ব্যাপারটা

দাঁড়ায় এই, নিউট্রন বেচারা কেন্দ্রীনের ফাঁদে বেমালুম বন্দী হয়ে পড়ে। ধীরগতির জন্যে সে কেন্দ্রীনের কাছে একটু বেশি সময়ক্ষেপ করে ফেলেছিল, তাইতেই এই ফ্যাসাদ। ঘটনাটা ঘটে অবশ্য এক সেকেণ্ডের লক্ষকোটি ভাগের একশকোটি ভাগের একভাগ সময়ে। পরমাণুর কেন্দ্রীনে একটি বেশি নিউট্রন যোগ হওয়ায় পারমাণুটির 'পারমাণবিক ভর' বেশি হয়ে দাঁড়াল, আর আমরা লাভ করে বসলাম একটি নতুন পরমাণু—প্রথমটির একটি তেজস্ক্রিয় জুড়িদার।

ইউ-২৩৫ পরমাণুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এখন একটু অন্যরূপ নিতে শুরু করে। এর কেন্দ্রীনে আছে ৯২টি ধনাত্মক প্রোটন এবং প্রত্যেকটি প্রোটনেরই আবার দুটো করে চরিত্র। একদিকে কেন্দ্রক শক্তির (Nuclear force) প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাকের ফলে কেন্দ্রীনের অন্য প্রোটন বা নিউট্রন কণিকাগুলোর সঙ্গে তা জোরালো আকর্ষণের টানে বাঁধা পড়ে আছে। অন্যদিকে ধনাত্মক তড়িৎশক্তি তাকে অন্য সমস্ত সমধর্মী প্রোটন থেকে যথাসম্ভব দূরে বিকর্ষিত করতে চাইছে। নিউট্রনটি কাছাকাছি এগুতেই কেন্দ্রীনের ঘূর্ণিপাক শক্তির বল বেড়ে গেল তার ঘরের বাসিন্দা প্রোটন ও নিউট্রনদের (নিউক্লিয়নেরা) সঙ্গে। নিউট্রনটি আকর্ষণ করতে লাগল নিউক্লিয়নগুলোকে, যারা উলটে আকর্ষণ করতে লাগল নিউট্রনকে। এই দোটানার মধ্যে খাবি খেতে থাকা কেন্দ্রীনের নিউক্লিয়নগুলোর মধ্যে পারস্পরিক টানটা কিছু দুর্বল হয়ে দাঁড়াল। অমনি বিকর্ষণের শক্তি সুযোগ পেয়ে ঘাড়ে চেপে বসল। তড়িৎ-যুক্ত প্রোটনগুলো দুই বিপরীত দিকে সরতে শুরু করল, কেন্দ্রীনটি হয়ে দাঁড়াল অস্থায়ী ও বিস্ফোরণের সঙ্গে ভেঙে দুটো টুকরো হয়ে গেল।

বিভাজন

একটি কথা। নিউট্রনের আঘাতে ইউ-২৩৫ পরমাণুকেন্দ্রীণের বস্তুর সবটুই কিন্তু ভেঙে পড়ল না। ভাঙল এক-হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। আর তাইতেই জন্ম নিল প্রচণ্ড শক্তি আর সেই সঙ্গে দুটি হালকা তেজস্ক্রিয় জুড়িদার। প্রচণ্ড বেগে ছাড়া পেল কয়েকটি বিটা কণার দল ও গামা রশ্মি। আর সবচেয়ে দরকারি যে উপাদানটি আমরা পেলাম, সে হলো আরো বেশি নিউট্রন। নিউট্রনের ওপর কেন এতখানি গুরুত্ব দেওয়া? কারণটা খুবই পরিষ্কার। নিউট্রন ছাড়া ইউ-২৩৫ এর বাকি পরমাণুদের কেন্দ্রীনগুলোকে ভাঙার কাজটা চালাবে কে?

একটি পরমাণুকেন্দ্রীন থেকে ছাড়া পাওয়া নিউট্রনেরা ইউরেনিয়ামের মধ্যে দিয়ে প্রায় উড়েই চলে। (কারণ পরমাণুর বেশির ভাগ জায়গাটা ফাঁকা বললেই হয়।) এরা আবার প্রতিবেশী পরমাণুদের কেন্দ্রীনে ভাঙার কাজ জুড়ে দিল। ছাড়া পেল আরো বেশি নিউট্রন ও জন্মেই অন্য পরমাণুকেন্দ্রীনদের ভাঙার কাজে লেগে গেল। ভাঙার কাজটা এভাবে শিকলি বা শৃঙ্খলের মতো ছড়িয়ে যায় বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে পরম্পর প্রক্রিয়া (chain reaction)। ইউ-২৩৫-এর পরমাণুদের কেন্দ্রীনের পর কেন্দ্রীনে ভাঙন ঘটতে ঘটতে ছাড়া পাবে এক বিপুল শক্তি আর তাই থেকে উদ্ভব হবে এক প্রচণ্ড তাপের। পারমাণবিক বোমার কাজের ধারাটাও ঠিক এমনি। বহুসংখ্যক ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীনের ভাঙন থেকে এভাবে হিরোশিমার ওপর ফেলা পরমাণু বোমার তাপ ও ধ্বংসের ক্ষমতা জন্ম নিতে পারে। নিউট্রনের দ্বারা পরমাণুকেন্দ্রীনের এই ধ্বংসপ্রক্রিয়ার নাম হলো বিভাজন (Fission)।

ভূগর্ভে প্রচুর ইউরেনিয়াম রয়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা প্রকৃতি নিজে থেকে তার সেই ভাণ্ডারে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে না; পারলে সমস্ত পৃথিবীটাই পরমাণু বোমার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো। আসল প্রয়োজনটা হলো, বাইরে থেকে একটা উপযোগী পরিস্থিতি তৈরি করা—কিছু বুলেটরূপী নিউট্রনের জোগান দেওয়া। তারপর সেই বুলেট চালানোর জন্যে বাড়তি শক্তি খরচার দরকার নেই। ইউ-২৩৫ পরমাণুকেন্দ্রীনের বিভাজন চলবে নিজেরই তাগিদে।

একটা কথা ভাববার আছে। যে বাড়তি নিউট্রনগুলো তৈরি হচ্ছে ইউ-২৩৫-এর মধ্যে, তারা যদি বাকি পরমাণুকেন্দ্রীনগুলোর ঘাড়ে না পড়ে ফসকে বেরিয়ে যায়, তা হলে বিভাজনের পালার সেখানেই ঘটবে ইতি। পরমাণুগুলো প্রায় ফাঁকা গড়ের মাঠ বলেই এই ভাবনাটা রয়েছে। অতএব আমাদের চাই ইউরেনিয়ামের এতবড় একটা স্তূপ (pile), যাতে ফসকে যাওয়া নিউট্রনের সব ক্ষতি পূরণ হয়েও কাজ চালানোর মতো নিউট্রনের সরবরাহ চালু থাকে। পরমাণুবিজ্ঞানীরা এই ইউরেনিয়াম স্তূপকে নাম দিয়েছেন ক্রান্তিমাত্রিক ভর (critical mass)।

একটি পরমাণু বোমার ক্ষেত্রে এই ক্রান্তিমাত্রিক ভরের পরিমাণ এক কিলোগ্রাম বা এক সের দেড় ছটাকের কম হলে চলে না। বস্তুখণ্ডকে দুটো টুকরোয় আলাদা করে রাখা হয়। একসঙ্গে জুড়ে দিলেই শুরু হয়ে

যায় পরস্পর প্রক্রিয়া ও বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় ফেটে পড়ে। নব্ব
একহাজার ভাগের একভাগ মাত্র ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তার
দেখেই আমাদের আতঙ্কের শেষ নেই। পুরো ভরটা শক্তিতে রূপ
যে কি হতো, তা ভাবার চেষ্টা না করাটাই ভালো।

গোত্রান্তর

ইউরেনিয়াম ধাতুর মধ্যে ইউ-২৩৮ জুড়িদারটাই জুড়ে আছে প্রায় নব্ব
জায়গা। নিউট্রনের আঘাত হেনে ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীনে বিভা
ঘটানো গেল ঠিকই, কিন্তু ইউ-২৩৮-এর অতখানি বস্তু কি অনাবাদী
থাকবে? ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়, দেখা যাক। ইউ-২৩৮-এর পরমাণুকেন্দ্রী
নিউট্রনও বন্দী হয়ে পড়ে ঠিকই কিন্তু তার ফলে সেখানে বিভাজন ঘটে
পরিবর্তে এক ক্ষণস্থায়ী আইসোটোপ ইউ-২৩৯ জন্ম নেয়। আর
ইউ-২৩৯-এর পরমাণু একটি কাজ করে বসে—কেন্দ্রীনে আছে যে নিউট্র
দল তাদেরই কোনো একটির ইলেকট্রনকে মুক্ত করে মুক্তি দেয় সঙ্গী প্রোটন
ছুয়ের যুগ্ম বাঁধন থেকে। অমনি একটি তড়িৎ-চার্জ বেড়ে উত্তর-ইউরেনি
সম্পূর্ণ একটি নতুন পদার্থ ৯৩ নং নেপচুনিয়ামের জন্ম হয়। নেপচুনিয়া
পরমাণু-কেন্দ্রীন বড় ক্ষণস্থায়ী। চট করে আর একটি নিউট্রনের ইলেকট্র
মুক্তি দিয়ে, এক ইউনিট তড়িৎ-চার্জ বাড়িয়ে নেপচুনিয়ামের গোত্রান্তর হয় এ
সম্পূর্ণ নতুন পদার্থে—যার নাম প্লুটোনিয়াম। পরমাণুবিজ্ঞানের সৌভাগ্য
এই নবসৃষ্ট মৌলিক পদার্থ প্লুটোনিয়ামের পরমাণুকেন্দ্রীন ক্ষণস্থায়ী নয়
তার অন্তঃপুরে বিভাজন ঘটানোয় কোনো বাধা নেই। সম্পূর্ণ অনা
ইউ-২৩৮ ক্রমাগত ভোল পালটে, আপন বন্ধ্যাত্বকে ঘুচিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এ
পারমাণবিক জ্বালানিরূপে নবজন্ম পরিগ্রহ করল। একটা বিরাট কাজ
হলো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পারমাণবিক চুল্লি

পরস্পর প্রক্রিয়ার চাবিকাঠি হলো নিউট্রন। ক্রমাগত জন্মাতে থাকা বাড়
নিউট্রনের কল্যাণে একতাল ইউ-২৩৫-এর মধ্যে এ প্রক্রিয়াটা ছড়িয়ে
অত্যন্ত তীব্র গতিতে। এ গতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছে না থাকলে পরিণতি
হচ্ছে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ। আর সে গতিকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ কর

পারলে পাওয়া যাবে পারমাণবিক শক্তি। এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে তা থেকে তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের সুচারু আয়োজন যে যন্ত্রে করা হয়েছে, তাই হলো পারমাণবিক চুল্লি (Nuclear Reactor)। সংক্ষেপে আমরা রিয়্যাকটর কথাটাই ব্যবহার করব।

রিয়্যাকটরে জ্বালানির কাজ করবে ইউরেনিয়াম ধাতুর জুড়িদার ইউ-২৩৫। তবে সেখানে কতকগুলো বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। প্রথম কথা, যতটা সম্ভব বিশুদ্ধ জ্বালানিকে রাখতে হবে। তা না হলে যে নিউট্রনেরা ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীনে আঘাত হানবে, তাদের বেশির ভাগেরই ইউ-২৩৮ ও অন্যান্য বিমিশ্র পদার্থের পরমাণুর ফাঁদে ধরা পড়ে গিয়ে একেবারেই অকেজো হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় কথা, নিউট্রনদের পক্ষে রিয়্যাকটরের চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে পড়াও কিছু বিচিত্র নয়। সেরকম কিছু হলে নিউট্রনদের ঘাটতির সংখ্যা বেড়েই চলবে। আর তৃতীয় কথাটা হলো, নিউট্রনদের ছুটে চলার বেগটা এমনিতেই একটু বেশি বলে তারা অমনিধারায় অন্য পদার্থের পরমাণুর ফাঁদে ধরা পড়ে যায়। এ তুটি সমস্যার সমাধান দরকার।

আসল কথাটা হলো, রিয়্যাকটরের কাছ থেকে কাজ পেতে গেলে পরস্পর প্রক্রিয়াকে চালু রাখতেই হবে। ঠিক সেই কারণেই আমাদের নজর রাখতে হবে ইউ-২৩৫-এর পরমাণুদের বরাদ্দে নিউট্রনের ঘাটতি যেন না পড়ে। সেজন্যে দরকার নিউট্রনকে মন্দগতি করে তোলা। কি ভাবে তা সম্ভব হতে পারে? বোরোন বা কার্বন ধাতুরই একরূপ গ্রাফাইটকে নিউট্রনদের মডারেটর বা ব্রেক হিসেবে কাজে লাগিয়ে দেওয়া ঠিক হলো। যে মধ্যস্থতা করে তাকেই মডারেটর বলা হয়। মডারেটররূপী এই গ্রাফাইটের মধ্যে পথ করে নিতে গিয়ে নিউট্রনেরা আপনা থেকেই মন্দগতি হয়ে আসে, তাই তাদের আবার বন্দী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

একটি আধুনিক রিয়্যাকটরের চেহারা মোটামুটিভাবে কল্পনা করা যাক। সমান আকারের কতকগুলো গ্রাফাইটের খণ্ড একটি জায়গায় পরস্পরের মধ্যে খানিকটা ফাঁক বজায় রেখে পাশাপাশি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সাজানো আছে। তুটি গ্রাফাইট খণ্ডের মাঝে ওই ফাঁকটুকু রাখা হয়েছে নলাকৃতি টিউব বসানোর জন্যে। টিউবগুলোর মধ্য দিয়ে জল আনার [illegible] করা হবে চালু রিয়্যাকটরের তাপকে ঠাণ্ডা করার জন্যে, আবার

ওরই মধ্যে ইউরেনিয়াম ধাতুখণ্ডদের বসবার আসন তৈরি করে রাখা হয়ে দুটো ইউরেনিয়াম ধাতুখণ্ডের মাঝে এভাবে গ্রাফাইটের একটা আড়াল গেল।

ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীনকে ভাঙার হাতিয়ার নিউট্রন আসবে কো থেকে? সে ব্যবস্থার জন্যে রেডিয়াম ধাতুর একটি টুকরোকে রিয়্যাকট মধ্যে কোথাও জায়গা করে দেওয়া হলো। রেডিয়াম থেকে সবসময় বিকি ঘটছে আলফা রশ্মির। এই রশ্মির গতিপথে বসানো রয়েছে বেরিলি ধাতুর একটি হালকা পাত। ধাতুপাতের সঙ্গে আলফা রশ্মির সংযোগ হ জন্ম নিল নিউট্রনের দল। জন্মেই ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীন ভা কাজে লেগে গেল। পরস্পর প্রক্রিয়ায় সমস্ত ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীন একসঙ্গে ভেঙে বসতে পারে। জন্মানো প্রচণ্ড শক্তির আলোড়নে পর বোমার বিস্ফোরণের রূপ নিয়ে বসবে। কিন্তু সে পথ বন্ধ করতে অথচ শক্তিও চাই। সমস্যার সমাধানের জন্যে রয়েছে ক্যাডমিয়াম ধা বিশেষভাবে তৈরি ইস্পাতদণ্ড। নিউট্রনদের চমৎকারভাবে শোষণ ক ক্ষমতা এদের রয়েছে। রিয়্যাকটরে এদের নিচের দিকে নামিয়ে দি পরস্পর প্রক্রিয়া মন্দগতি হয়ে পড়বে, আবার ওপরের দিকে টেনে তুল সে গতি যাবে বেড়ে।

রিয়্যাকটর কিছুক্ষণ চালু থাকলেই ভেতরে প্রচণ্ড তাপ জমে ওঠে। তাপ কমানোর জন্যে সবসময়ে ঠাণ্ডা জলের চালু ব্যবস্থা রাখা দরকা আর একটি কাজে ত্রুটি ঘটলে চলবে না। তা হলো, রিয়্যাকটরের চা পুরু সিমেণ্ট ও কংক্রিট দিয়ে গেঁথে দেওয়ার কাজ। যে সব নিউট্রন, ও অন্যান্য রশ্মি পরমাণুকেন্দ্রীন থেকে ছাড়া পাচ্ছে, মানবদেহের জীবকো ওপর তাদের প্রভাব হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও মারাত্মক। বাইরে আ সার্টিফিকেট এরা যেন কোনোমতেই না পায়। তাই এই নিরাপত্তার ব্যব

রিয়্যাকটরে ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রীনকে ভেঙে যে পারমাণবিক পাওয়া গেল, তা থেকে তড়িৎশক্তি পাব কিভাবে? রিয়্যাকটরে জন্মাচ্ছি প্রচুর তাপ, সেটা গোড়ার দিকে তৈরি রিয়্যাকটরগুলোতে নষ্ট হ সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম তাকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা কর রিয়্যাকটরের তাপ ঠাণ্ডা করতে ঢুকে জল বাষ্পে ভোল পালটে ফে সেই বাষ্পকে বাইরে বার করে নিয়ে এসে বাষ্পশক্তিচালিত টারবাই

চালু করা হলো, সেই টারবাইন চালাল জেনারেটরকে। জেনারেটরকে কোনো শক্তি দ্বারা চালু করতে পারলেই তার থেকে পাওয়া যায় বিদ্যুৎশক্তি। পারমাণবিক শক্তির কল্যাণময় রূপ ধরা দিল যার মধ্যে, সেই পরমাণুশক্তিকেন্দ্র (Atomio Power Station) তৈরির প্রথম গৌরব অর্জন করলেন রুশ বিজ্ঞানীরা। পাঁচ হাজার কিলোওয়াট (এক কিলোওয়াট= এক হাজার ওয়াট; ওয়াট হলো তড়িৎশক্তির একক বা মাপনী) তড়িৎশক্তি তৈরির ক্ষমতা ছিল সেই স্টেশনের। বর্তমানে রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে কয়েক লক্ষ কিলোওয়াট মাপের পরমাণুশক্তিকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

ভারতবর্ষেও বোম্বের কাছে ট্রম্বেতে কয়েকটি পারমাণবিক রিয়্যাকটর নির্মিত হয়েছে। তবে বিদ্যুৎশক্তি পাবার ব্যবস্থা সেখানে নেই। আপাতত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপই শুধু পাওয়া যাবে। ভারতের প্রথম পরমাণু শক্তিকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে গুজরাটের তারাপুরে; তিন থেকে চার বছরের মধ্যে যেটি কার্যকরী হয়ে উঠবে। উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ হবে ৮০ মেগাওয়াট (১ মেগাওয়াট= ১০ লক্ষ ওয়াট)। ভারতের ত্রিবাংকুরের সমুদ্র উপকূলে বালুরাশির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মোনাজাইট আছে। এই মোনাজাইট থেকে থোরিয়াম নামে একটি বস্তুকে নিষ্কাশিত করা যায়, যার পরমাণুকেন্দ্রীন ইউরেনিয়ামের মতোই বিদারণশীল। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে ভারতের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

কয়লা ও পেট্রোলের বিকল্প জ্বালানির আসন গ্রহণ করেছে পদার্থের পরমাণু। ভবিষ্যতের ছবিটা খুবই রোমান্টিক বলে মনে হতে পারে। একটা বিরাট পরমাণুচালিত যাত্রীবাহী জাহাজের সারা বছরের চলবার পাথেয় হবে একটি বড় ড্রামভর্তি তরল নিউক্লিয়র গ্যাস। পরমাণুশক্তিচালিত রুশ বরফভাঙার জাহাজ 'লেনিন' ও আমেরিকান সাবমেরিন 'নটিলাস'-এর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমাদের পরিচয় ঘটেছে। ছোট একটিন পারমাণবিক জ্বালানিতে একটি বড় যাত্রীবাহী বিমানের সারা বছরের সমস্যা মিটবে। মোটরগাড়ির পথের দুপাশে আর পেট্রোল স্টেশনের দরকার নেই, কারণ ওর পরমাণু-চালিত ট্যাংকে একবার জ্বালানি ভরলেই গোটা বছর চলে যাবে। একটি সাধারণ পাঁচ লক্ষ কিলোওয়াট তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে (Thermal Power Station) সারা বছর চালাতে হলে কয়লা লাগে এক লক্ষ ওয়াগন। আর একই শক্তির পরমাণু কারখানা সারা বছর ধরে চালাতে লাগবে মাত্র তিন কি

চার ভাবা সাধারণভাবে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম। এ সব কল্পনাই একদিন সত্যি হয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে।

তেজস্ক্রিয় জুড়িদার

পারমাণবিক রিয়্যাকটরে আর একটি অপরূপ বস্তু তৈরি হবে—তেজস্ক্রিয় জুড়িদার (Radioactive Isotope)। বর্তমানের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরা এক যুগান্তর এনে দিয়েছে। একটি রিয়্যাকটরে খুব সহজেই এদের তৈরি করা যায়। চালু অবস্থায় একটি রিয়্যাকটরে বিভাজনের কাজে নিযুক্ত ছাড়াও কিছু উপরি নিউট্রন মজুত থাকে। তবে ওরা কিন্তু কোনো স্থির হয়ে নেই—সদা অস্থির, সদাচঞ্চল ওদের মতিগতি। রিয়্যাকটরে যদি স্থায়ী (stable) কোনো মৌলিক পদার্থ রেখে দেওয়া যায়, তাহলে ওরা পরমাণুকেন্দ্রীনেরা ওই উপরি নিউট্রনদের মধ্য থেকে দু-একটিকে বেমালুম উদরস্থ করে বসবে। অমনি শুরু হবে প্রতিক্রিয়া। বাড়তি নিউট্রন লাভ করে পরমাণুদের তড়িৎ-চার্জ বাড়ল না, রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন হলো না। কিন্তু কেন্দ্রীনের প্রতিক্রিয়ায় সরল সাদাসিধে পরমাণুগুলো একটা তেজস্ক্রিয় জুড়িদারের জন্ম দিয়ে বসবে। জন্মেই কি নিস্তার আছে? সেই মুহূর্ত থেকে এরা নিজেরাই মেতে ওঠে আপন আপন মৃত্যুর ব্যবস্থাপনায়। জন্মলগ্নে যেটুকু তেজ এরা লাভ করেছিল, সেটুকুই বিটারশ্মি, ইলেকট্রন অথবা পজিট্রন এর কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলফারশ্মি বিকীরণের কাজে লেগে যায়। এই বিভিন্ন রশ্মির কল্যাণে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি—যেমন ক্যান্সার টিউমার প্রভৃতি বহুল পরিমাণে আজ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এসেছে। তেজস্ক্রিয় ফসফোরাস প্রয়োগ করে জমির ফলন পর্যন্ত বহুগুণ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে। এদের অনেকেরই আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কাজেই তৈরি হবার স্বল্প সময়ের মধ্যেই এদের কাজে লাগিয়ে দিতে হয়।

লঘু কেন্দ্রকের সঙ্গম : ফিউসন

বিজ্ঞানীরা আবার চিন্তিত হয়েছেন উত্তরপুরুষদের কথা ভেবে। হিসেব করে দেখা গেল কয়লা ও পেট্রোল যখন একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাবে, তারপর পৃথিবীর শক্তির চাহিদা মেটাতে গিয়ে তার সমগ্র ইউরেনিয়াম সঞ্চয় দুশ বছরের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। তখন শক্তির চাহিদা মিটবে কি দিয়ে?

সেটা নিয়েই বিজ্ঞানীরা ভাবছেন। আর একটি যে দুর্ধর্ষ মারণাস্ত্র তৈরি হয়েছে, সেই হাইড্রোজেন বোমার শক্তিকে যদি শান্তিমূলক কাজে লাগানো যায়, তাহলে কোটি কোটি বছরেও মানুষের আর কোনো শক্তিসমস্যা দেখা দেবে না।

তার কারণ, হাইড্রোজেন বোমার মূল উপাদান ডয়টেরিয়াম বা ভারি হাইড্রোজেন সমুদ্রের জলে আছে প্রচুর মাত্রায়। পৃথিবীর জলসম্পদের ছ হাজার ভাগের একভাগই হলো ভারি জল। ভারি জলের উপাদান ডয়টেরিয়ামের পরিমাণও তাই বিপুল অংশের কোঠায় গিয়ে পৌছবে। ইন্ধন হিসেবে এত সস্তাও আর কিছু নেই। চারশ টন ডয়টেরিয়ামে অনায়াসে একশকোটি টন তেল আর কয়লার কাজ চলে যাবে।

ডয়টেরিয়ামের কাছ থেকে প্রচুর শক্তি পেতে হলে তুলনায় ভারি হিলিয়াম পরমাণুতে এর রূপ পালটে ফেলতে হবে। তার জন্যে এর সঙ্গে সঙ্গম ঘটাতে হবে হয় সাধারণ হাইড্রোজেনের, না হয় হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় জুড়িদার ট্রাইটিয়ামের (পরমাণুর কেন্দ্রীনে আছে একটি প্রোটন, দুটি নিউট্রন)। সঙ্গমের জন্যে যে গুরুদক্ষিণার বরাদ্দ রয়েছে তার অঙ্কটায় চক্ষুস্থির হবার ব্যাপার। ট্রাইটিয়ামের সঙ্গে ডয়টেরিয়ামের সঙ্গমে হিলিয়ামে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় সাফল্য ঘটতে পারে দশ লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপের পরিমণ্ডলে। কিন্তু ট্রাইটিয়াম প্রকৃতির রাজ্যে বড়ই দুর্লভ। কাজেই ডয়টরিয়ামকে নিজেরই সগোত্র বা সাধারণ হাইড্রোজেনের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হতে হবে এবং সে অবস্থায় হিলিয়াম গঠনের সাফল্য অর্জনে প্রয়োজনীয় তাপের মাত্রা হলো ত্রিশ কি চল্লিশ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

হাইড্রোজেন বোমাকে ফাটানোর আগে তার কেন্দ্রে বসানো একটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সেই তাপে হালকা হাইড্রোজেন পরমাণুরা জুড়ে গিয়ে হিলিয়ম পরমাণুকে তৈরি করে। পরমাণু বোমার তুলনায় অনেক বেশি ভর এখানে শক্তিতে পরিণত হয়, ফলে সেই শক্তির চেহারাও হয় প্রচণ্ড ভয়াবহ। সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রের বুকে অহরহ এ ঘটনা ঘটে চলেছে। সূর্যে চার কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপের পরিমণ্ডলে পরমাণুদের পরস্পর ঠোকাঠুকি বেড়ে যায়। এই ধরনের এক-একটি সংঘাতে খসে যেতে থাকে কেন্দ্রকের সঙ্গে পরিধির ইলেকট্রনের যোগবন্ধন। সমগ্র গ্যাসীয়মণ্ডল হয়ে ওঠে পুরোপুরি আইওনাইজ্‌ড্ অর্থাৎ রাশি রাশি ধনাত্মক

প্রোটন ও ঋণাত্মক ইলেকট্রনের এক জগাখিচুড়ি। সাধারণ গ্যাসের অ সেটা আর নয়। একেই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন প্লাজ্‌মা বা পদার্থের বি চতুর্থ দশা। এ দশার ধর্ম পদার্থের কঠিন, তরল বা বায়বীয় কোনো অব সঙ্গেই মেলে না।

এত তাপ বজায় রেখে লঘু হাইড্রোজেন ও ডয়টেরিয়াম পরমাণুদের স ঘটাতে গেলে পৃথিবীর যে কোনো তাপপ্রতিরোধক পাত্রই পুড়ে ছাই হ যাবে। কিন্তু যদি কুণ্ডলাকার কোনো ফাঁপা নলের দেয়ালে তাদের স্প না দিয়ে ঠিক মাঝামাঝি ফাঁকা স্থানটায় রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তা সমস্যাটার আংশিক সমাধান ঘটে। প্রচণ্ড মাত্রায় বিদ্যুৎশক্তি পাঠিয়ে, ডয়টেরিয়াম প্লাজ্‌মার তাপ ক্রমাগত বাড়িয়ে লঘু হাইড্রোজেন পরমাণু সঙ্গম ঘটানো (Fusion) সম্ভব হবে—যার পরিণতি হলো হিলিয়াম পর সমস্ত প্রক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার একটি পরিকল্পনা রুশ বিজ্ঞা উপস্থাপিত করেছিলেন। বছর কয়েক আগে ইংরেজ বিজ্ঞানীরা একটি য বানিয়েছেন, যার নাম দিয়েছেন Zeta (Zero Energy Thermonucle Assembly) বা তাপ-কেন্দ্রক সংযোজনাগার। শূন্য তেজের বিশেষ খুবই উপযুক্ত হয়েছে। কারণ এখানে পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রা থেকে যে পরিমাণ তেজ পাওয়া যাচ্ছে, খরচ হচ্ছে তার লক্ষ কোটি গুণ তেজ। কর্মপটুতা (Efficiency factor) প্রায় শূণ্যের কোঠায়।

যে বিরাট সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত এই সব পরীক্ষার ভেতর দি প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে কল্পনা স্তম্ভিত হয়ে উঠবে। মানুষ দরকার কৃত্রিম সূর্য তৈরি করতে পারবে তার পৃথিবীর ওপরে। যে সূর্য হবে আ সূর্যের সম-দীপ্তিমান, কিন্তু তার তেজের কারখানাটা সম্পূর্ণই মানুষের নিয় মানুষ তার প্রয়োজনমতো শক্তি সেই তেজভাণ্ড থেকে গ্রহণ করে নেবে।

পরমাণুর অভ্যন্তরে ধ্বংসের চেহারা আমরা দেখেছি ঠিকই। কিন্তু তা কল্যাণের রূপটাই অনেক বেশি উজ্জ্বল, অনেক বেশি সত্য। সে রূপ, সে শ শান্তিপূর্ণ রূপায়ণে মানুষ তার ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে অনেক সুন্দর করে তুলবে। আজ যে পৃথিবীর স্বপ্ন আমরা দেখি, তা বাস্তব হয়ে উঠবে আমা উত্তরপুরুষদের হাতে।

শান্তির সংগ্রামে ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহ্য

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যুদ্ধ ও শান্তির বা সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে ইওরোপে তথা সমগ্র পৃথিবীতে রাষ্ট্রনীতি ছিল অত্যন্ত সরল। যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আছে, সে প্রয়োজন ও ইচ্ছা বোধ করলেই পার্শ্ববর্তী অথবা দূরবর্তী পররাজ্যকে আক্রমণ করতে পারে, তার অংশবিশেষ দখল করতে পারে অথবা সমগ্র দেশটাকেই আত্মসাৎ করতে পারে। তার পথে বাধাস্বরূপ কোনো নীতি বা বিবেকের প্রশ্ন ছিল না, একমাত্র অপর কোনো শক্তিমান রাজ্যের লোভ বাদ সাধতে পারত। এমনও দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে ইওরোপের পরাক্রান্ত একাধিক রাষ্ট্র কোনো দুর্বল প্রতিবেশীকে শুধুমাত্র তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বারেবারে গ্রাস করে, শেষ অবধি তার অস্তিত্বই শতবর্ষের জন্য লুপ্ত করে দিল (পোল্যাণ্ডের মর্মান্তিক ব্যবচ্ছেদ)। আর হিংস্র শ্বাপদের মতো এসিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য গড়ার কাহিনী তো সর্বজনবিদিত। বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত ডঃ জনসনের সেই উক্তিটি স্মরণীয়: "আমেরিকাতে (কানাডা) ইংরেজ ও ফরাসীরা সব ব্যাপারেই ঝগড়া ও যুদ্ধ চালাচ্ছে, শুধু একটা ব্যাপারে তারা উভয়েই একমত—তা হচ্ছে এই যে উত্তর আমেরিকা ইংরেজ বা ফরাসী যার দখলেই আসুক না কেন, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ঐ দেশে কোনো অধিকারই নেই।"

এমনই এক যুগে, যখন বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে হিংস্র পররাজ্যলোভী যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের জয়পতাকা উড়ছে সর্বত্র, তখন ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে এক গণবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে জন্ম নিল নতুন পৃথিবীর প্রথম সন্তান—ফরাসী বিপ্লব। আকাশে উড়ল নতুন আদর্শের নিশান—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতি ও জনগণের জন্মগত অধিকার। আইনের চোখে সব মানুষই সমান, জীবনে বিকাশের সমান সুযোগ সকলকেই দিতে হবে। যুদ্ধ নয়, পররাজ্যহরণ নয়, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী। ফরাসী দেশের নতুন সার্বভৌম সংবিধান পরিষদ (Constituent Assembly) ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের

২২শে মে তারিখে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নতুন পররাষ্ট্রনীতির গোড়াপত্তন
জানাল :

> "পরদেশ জয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধে নামার নীতিকে
> জাতি নিন্দা করছে, পরিত্যাগ করছে এবং জানিয়ে দিচ্ছে যে
> দেশে জনগণের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তারা কখনও শক্তি
> করবে না।"

তখনকার বাস্তব অবস্থাটি আমাদের মনে থাকা প্রয়োজন। ফ্রান্সে
বিজয়ী, কিন্তু রাজতন্ত্র তখনও নির্মূল হয় নি। রাজতন্ত্রী অভিজাতরা
ষড়যন্ত্র করছে বিদেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফরাসী বিপ্লবকে
হত্যা করার। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া সহ রাজন্যবর্গের বিরাট সেনাদল
বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে, জনগণের সদ্যোলব্ধ অধিকারকে রক্তস্রোতে মুছে
স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সংকল্প ঘোষণা
এই পরিস্থিতিতে, মাতৃভূমি ও বিপ্লবকে রক্ষা করার দুর্জয় সংকল্প নিয়েই
ফ্রান্সও যুদ্ধের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়। সেই সূত্রেই আসে ১৭৯
মে মাসের ঐ বিখ্যাত ঘোষণাটি। বিপ্লবের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দল ও
প্রহরী জ্যাকোবিনরা এই সূত্রে তাদের নীতি আরও স্পষ্ট ভাবে তুলে
রোবস্‌পিয়ের বলেন "ফ্রান্স নিজের এক ইঞ্চি জমিও আত্মসমর্পণ করবে
ফ্রান্স পররাজ্যের এক ইঞ্চি জমির প্রতিও লোভ করে না।"

১৭৯২-এর ১০ই আগস্ট পারী সহরের জনতার গণঅভ্যুত্থানের ফলে
প্রজাতন্ত্রের পথে পা বাড়াল। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটের ভিত্তিতে
হলো নতুন সার্বভৌম গণপরিষদ—মহাসম্মেলন (The Conventio
বিপ্লবের প্রজাতন্ত্রী ও বামপন্থী সমর্থকরাই এ সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ
কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিল গুরুতর মত পার্থক্য। দেশরক্ষার
বিদেশী রাজাদের সেনাদলকে মাতৃভূমি থেকে পরিপূর্ণভাবে বিতাড়িত
প্রশ্নে সবাই একমত। কিন্তু তারপর? বিজয়ী বিপ্লবী সেনাদল কি
করবে পররাজ্যের অভ্যন্তরে? অস্ত্রের জোরে উচ্ছেদ করবে
সামন্ততন্ত্রকে, অভিজাততন্ত্রকে, মুক্ত করবে জনগণকে? না,
সীমানায় পৌঁছে থেমে যাবে বিজয়ী বিপ্লবীরা? সীমানা থেকেই
করবে রোবস্‌পিয়েরের দৃপ্ত বক্তব্য যে "ফ্রান্স নিজের দেশের এক ইঞ্চি
অপরকে ছেড়ে দেবে না, কিন্তু ফ্রান্স অপরের দেশের এক চুল জমিও চায় না

মহাসম্মেলনে যুদ্ধকে সর্বত্র প্রসারিত করার সপক্ষে বলতে গিয়ে ব্রিসো (Brissot) পররাজ্যে ফরাসী বিপ্লবের সেনাদলের যুদ্ধকে "ন্যায় যুদ্ধ" (Just war) বলে আখ্যা দেন। বেলজিয়ম থেকে ফিরে এসে দাঁত (Danton) ঘোষণা করেন "আমাদের সীমানা একমাত্র ইতিহাসই স্থির করবে।" রোবস্‌পিয়েরপন্থী একজন সদস্য যখন মহাসম্মেলনে চিৎকার করে ওঠেন "পররাজ্য জয় করা চলবে না" (No Conquests)—তখন দাঁত জবাব দেন "চলবে—ন্যায়ের সপক্ষে অভিযান।" ১৭৯২-এর ১৫ই ডিসেম্বর মহাসম্মেলন প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে ফ্রান্স অপর সকল দেশকে সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্ত করবে ও ঐ সকল দেশে সামন্ত-বিশেষ-অধিকার-সমূহ বাতিল হয়ে যাবে। বিপ্লবী সেনাদলের সাহায্যে ইওরোপকে মুক্ত করার নামে নতুন ধরনের যুদ্ধনীতি শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু এ নীতির বিরোধিতা করল গোড়া থেকেই রোবস্‌পিয়েরের নেতৃত্বে জ্যাকোবিন দলের একাংশ। বিপ্লব স্যুটকেসে ভরে একদেশ থেকে আর এক দেশে গায়ের জোরে চালান করা যায় না এ কথা এঁরা স্পষ্টভাবেই বুঝেছিলেন। এঁরা আরও বিশ্বাস করতেন যে যুদ্ধ (তা সে যে কারণেই হোক) বেশিদিন চললে জনগণের অধিকার হয় বিপন্ন, গণতন্ত্র হয় বিকৃত—মাথা চাড়া দিয়ে ক্রমে চেপে বসতে থাকে সামরিক একনায়কত্ব। ১৭৯২-এর আরম্ভে গণপরিষদে একটি বক্তৃতা দেবার সময় রোবস্‌পিয়ের যুদ্ধের মারফৎ বিপ্লবকে প্রসারিত করার নীতিকে আক্রমণ করে বলেন :

> "রাজনীতিবিদদের মাথায় যতরকম উদ্ভট পরিকল্পনা জন্মাতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে আপত্তিকর হচ্ছে এই যে বিদেশের জনগণের সামনে আমাদের সশস্ত্র সেনাবাহিনী যদি গিয়ে হাজির হয়, তাহলেই তারা আমাদের আইন ও সংবিধান গ্রহণ করবে। সশস্ত্র দূতদের কেউই পছন্দ করে না এবং তাদের প্রথম স্বাভাবিক মানসিক প্রতিক্রিয়া হবে এই দূতদের শত্রু বলে প্রত্যাখ্যান করা। ···আমাদের সেনাবাহিনীকে দেখে বিপ্লবী আদর্শের অগ্রদূত না ভেবে, তাদের শৃঙ্খল-রচয়িতা বলে মনে করাটাই হবে স্বাভাবিক। আমরা যদি সত্যিই চাই যে দেশবিদেশে আমাদের বিপ্লবের প্রভাব ছড়াক, তবে সসৈন্যে সেসব দেশে হাজির না হয়ে আসুন আমরা নিজেদের দেশে বিপ্লবকে আরো দৃঢ়মূল করি।"

ঐ বছরেরই শেষে সশস্ত্র সৈন্যদলের সাহায্যে পররাজ্য আক্রমণ করে

বিপ্লবকে প্রসারিত করার ভ্রান্তপথকে তীব্রতম ধিক্কার দিয়ে রোবস্পি বলছেন :

> "সশস্ত্র অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছিল। আ এখন যুদ্ধবাদীদের কার্যকলাপের ফলে আমাদের দেশকে সকলের ঘৃ পাত্রে পরিণত করা হচ্ছে, কলঙ্কিত করা হচ্ছে বিপ্লবকে।"

মহাসম্মেলনের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ কেন যুদ্ধের পথে গেলেন? কা তাঁরা দেশের মধ্যে বিপ্লবকে প্রসারিত করার বদলে, আসলে সামাজি রক্ষণশীলতার পথ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। যুদ্ধের উন্মাদনায় যতক্ষ সশস্ত্র জনগণকে মাতিয়ে রাখা যাবে ততক্ষণ দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক সামাজি প্রগতির যাত্রা যে ব্যাহত হচ্ছে তা তাদের চোখে পড়বে না। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেই বিপ্লবী জনগণ দেশে ফিরে দাবি করবে বিপ্লবের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক। কেঁপে উঠবে বিপ্লবকে যারা বিপর্যস্ত করতে চায় সেই রক্ষণশীলদের মসনদ। তাই যুদ্ধের উন্মাদনা থামাতে তারা রাজি ছিল না প্রস্তুত ছিল না রোবস্পিয়েরদের পরামর্শ শুনতে। একজন রক্ষণশীল নেতা তো স্পষ্ট বলেই ছিলেন : "সশস্ত্র জনগণ ফিরে এলে আমাদের মাথা কাটবে।"

পরবর্তীকালের ইতিহাস রোবস্পিয়ের ও তাঁর বন্ধুদের সমালোচনার যাথার্থ প্রমাণ করেছে। ফ্রান্স তার বিপ্লবী রাষ্ট্রকে হারাল তার কারণ অন্যান্য দেশে জনগণের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হলো মহান ফরাসী বিপ্লব রোবস্পিয়ের দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে এমন কি ইংলণ্ডেও ফরাসী বিপ্লবের সমর্থনে যে উদ্দীপনা প্রথম দিকে দেখা গিয়েছিল, তাই ছিল বিপ্লবের প্রধানতম সম্পদ। বিপ্লবী পররাষ্ট্রনীতির মূ কথা হওয়া উচিত ছিল "আমাদের দেশের অত্যাচারীদের আমরা উচ্ছে করে জনগণের সার্বভৌম অধিকার অর্জন করেছি, আমরা তোমাদের বন্ধু আমাদের পাশে দাঁড়াও, আমাদের শান্তিতে এগোতে দাও।" তাহলে ছড়িয়ে পড়ত দেশে দেশে বিপ্লবী পররাষ্ট্রনীতির প্রভাব। আর বন্দুকের জোরে ফরাসী আদর্শকে অপর দেশের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করায়, সেই সব দেশের জনগণ ফরাসী বিপ্লবকে এক নতুন ধরনের 'সাম্রাজ্যবাদ' বলে ধরে নিল এবং সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শকেই সম্বল করে ফরাসী সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। রোবস্পিয়ের ঠিকই বলেছিলেন আর সে কথা আজও সত্য : "বেয়নেটের ডগায় করে স্বাধীনতা কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া

যায় না।" ফরাসী বিপ্লবের ও মানবপ্রগতির দুর্ভাগ্য যে রোবস্পিয়েরদের মত সেদিন 'বিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদী' উন্মাদনার স্রোতে ভেসে গেল!

বহু বছর পরে সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগে লেনিনের নেতৃত্বে রুশ মার্কসবাদীরা সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের বন্দীশালাকে ভেঙে পৃথিবীর এক বৃহদংশে বিজয়ী করল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে। শোষণহীন শ্রেণীহীন নতুন মুক্ত মানবসমাজের জয়পতাকা উড়ল। ঘোষিত হলো নতুন পররাষ্ট্রনীতি— পৃথিবীর জনগণের জন্য শান্তি চাই। কেমন ধরনের শান্তি? "Peace without annexations, Peace without indemnities"—ক্ষতিপূরণ নয়, পররাজ্য হরণ নয়, প্রকৃত শান্তি। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে এক হাতে প্রতিহত করল তরুণ সোভিয়েত রাষ্ট্র, অন্য হাতে বাতিল করল রুশ সাম্রাজ্যবাদের সই করা সমস্ত পররাজ্য হরণ ও পীড়নের অন্যায় সন্ধিপত্রগুলি। সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির লেনিন-নির্দিষ্ট ভিত্তি হলো বিশ্বশান্তি ও বিভিন্ন সামাজব্যবস্থায় গঠিত রাষ্ট্রসমূহের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। বিপ্লব নিজ দেশে মজবুত করার মাধ্যমেই সারাজগতে আজ ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রভাব। রোবস্পিয়েরদের প্রসিদ্ধ ঘোষণারই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে সমাজবাদী সোভিয়েত রাষ্ট্রের কণ্ঠে :

> "আমরা মাতৃভূমির একচুল জমি অপরকে দখল করতে দেব না, পররাজ্যের এক চুল জমিও আমরা চাই না।"

শান্তির পতাকা হাতেই সেদিনও এগিয়ে যেতে চেয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা, শান্তিকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করা আজও তাই সাম্যবাদী বিপ্লবের ও প্রগতির সকল যোদ্ধাদের প্রধানতম কর্তব্য।

"বহু নদী স্রোতে সমুদ্রের দিকে যাত্রা পথে আমরা যারা দৃঢ় সংকল্প, তারা উৎসের প্রতি আনুগত্যকে কখনোই ভুলে যাব না।"

সোভিয়েত রাশিয়া এবং নিরস্ত্রীকরণ

[১৯২২—১৯৩৪]

সুনীল সেন

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা আলোচিত হয়ে... নিখিল বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বসেছিল, বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের ... যুক্তিতর্ক শোনা গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ব্যর্থ... নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক অস্ত্রীকরণ বৈঠকে পরিণত হয়। এর পরিণতি ... হয়েছিল তা আমাদের জানা আছে। বর্তমানে অস্ত্রসজ্জার দুরন্ত প্রতিযোগি... মুখে দাঁড়িয়ে আমরা পিছনের দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাব যে, ... একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া সাহস এবং দৃঢ়তার সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ ... সম্মুখীন হয়েছিল। নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো কেন? নিরস্ত্রীকর... সমস্যা কি ছিল? নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নীতির মূল ... কোন দিকে ছিল?

লীগ অব নেশনসের অনুশাসনের অষ্টম ধারায় উল্লিখিত ছিল ... 'জাতীয় নিরাপত্তা'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অস্ত্রসজ্জাহ্রাস শান্তি ... রাখবার জন্য প্রয়োজন। 'জাতীয় নিরাপত্তা' এবং নিরস্ত্রীকরণ—এই ... নীতির মধ্যে বিরোধ বাধে। প্রধান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি 'জাতীয় নিরাপত্... প্রশ্ন তুলে নিজেদের দেশের অস্ত্রসজ্জা হ্রাস করতে কুণ্ঠিত ছিল, ব্যা... আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা এই সমস্যাটি বিচার করতে ... প্রস্তুত ছিল না। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়ার ... 'জাতীয় নিরাপত্তা'র প্রশ্ন শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে মোটেই গৌণ ছিল ... ধনতান্ত্রিক দেশগুলির 'হস্তক্ষেপের যুদ্ধ'-র নিদারুণ অভিজ্ঞতা তার ... তৎসত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টায় নিবিষ্ট থাকে। আধুনি... ঐতিহাসিক গবেষণা এই বিষয়ে নতুন আলোকপাত করে।

১৯২২ সালের বিষণ্ণ বৎসরে সোভিয়েত রাশিয়া সর্বপ্রথম ... আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেল, সেটা ছিল জেনো...

সম্মেলন। হস্তক্ষেপের যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষা সবে সে পার হয়ে এসেছে। তার অর্থনীতি তখন বিপর্যস্ত। সম্প্রতি প্রকাশিত লেনিন-চিচেরিন পত্রাবলী থেকে জানা যায় যে, লেনিন স্বয়ং সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের জেনোয়া সম্মেলনে অনুসৃত নীতির কাঠামো নির্ধারণ করেছিলেন। তিনিই প্রতিনিধি-দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত তাঁর জেনোয়ায় যাওয়া হয় নি, সোভিয়েত জনগণের মনে আশঙ্কা ছিল যে, ধনতান্ত্রিক দেশে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হতে পারে। ইতিপূর্বে ডারা কাপলানের গুলিতে লেনিন আহত হয়েছিলেন। বৈদেশিক বিষয়ের মন্ত্রী চিচেরিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন, তাঁর সহকারী ছিলেন লিটভিনভ। রাশিয়ার এক সম্ভ্রান্ত বংশে চিচেরিনের জন্ম। কয়েকটা বিদেশী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। সোভিয়েতের প্রথম যুগের প্রধান কূটনীতিবিদদের তিনি অন্যতম। জেনোয়া সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল অর্থনৈতিক পুনর্গঠন। চিচেরিন তাঁর বক্তৃতায় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের অস্ত্রসজ্জা হ্রাসের সম্পর্কের কথা তুললেন এবং সেই প্রসঙ্গে অস্ত্রসজ্জা কমানোর প্রস্তাব পেশ করলেন। চিচেরিনের বক্তৃতা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বক্তৃতার একটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল:

> However, all efforts toward the reconstruction of the economic position of the world are vain, so long as there remains suspended over Europe and the world the menace of new wars, perhaps still more devastating than those of the past years.... The Delegation intend to propose...the general limitation of armaments, and to support all proposals tending to lighten the weight of militarism, on condition that this limitation is applied to the armies of all countries.

চিচেরিনের এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে অভিনব, এবং ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিদের কাছে অপ্রত্যাশিত। ফরাসী প্রতিনিধি ব্রাঁয় এই প্রস্তাবের আলোচনা বন্ধের দাবি জানান। চিচেরিনের প্রস্তাব জেনোয়া সম্মেলনে আলোচিত হবার মর্যাদা পেল না। 'প্রাভদা' লিখল: "সর্বদেশের জনগণ জানবে, কমিউনিস্টরাই নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল, আর

বুর্জোয়া সরকারেরা তা আলোচনা-বহির্ভূত করেছিল।" (২২শে
১৯২২)

জেনোয়া সম্মেলনের কিছু পরে সোভিয়েত রাশিয়া মস্কোতে
নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান করল (১২ই জুন, ১৯২২)। এটাই সোভি
রাশিয়ার অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ফিনল্যাণ্ড, পোল্যা
ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া এই সম্মেলনে যোগদান করে। সোভিয়েত প্রতিনি
দলের নেতা ছিলেন লিটভিনভ। এই সম্মেলনে সোভিয়েত প্রস্তাব
দেড় বা দু-বৎসরের মধ্যে সেনাবাহিনীর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কমানো
পোল্যাণ্ড এবং অন্যান্য রাষ্ট্র এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। মস্কো সম্মেলনে
ব্যর্থতার পরে দশম নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস দুনিয়ার জনগণের উদ্দে
এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রচারপত্র প্রকাশ করে:

> In Genoa, Soviet Russia and her allies propos
> general disarmament. When this was rejected, th
> proletarian government sought to secure disarmame
> within the limited area of the countries bordering o
> Soviet Russia.... But that initiative, too, was wrecke
> by the refusal of Russia's neighbours to accept effectiv
> reduction of their armies... Let the peoples deman
> peace of their governments. The cause of peace is i
> the hands of the people. (ইজভেস্তিয়া, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২২

শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে দুনিয়ার জনমত গড়ে তুলবার এ
প্রচেষ্টা অভিনব।

লীগ অব নেশনসের অনুশাসনের অষ্টম ধারা এতকাল কাগজে-কলমে
সীমাবদ্ধ ছিল। লোকার্নো চুক্তির পরে, অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চে জার্মানির পুনঃপ্রবেশ
পর্ব থেকে লীগ বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল এবং অষ্টম ধারার কথা আবা
শোনা গেল। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য ১৯২৫ সালে একটি
কমিশন নিয়োগ করা হলো। জেনেভাতে ১৯২৬ সালে প্রস্তুতি কমিশনের
প্রথম অধিবেশন বসে। আমন্ত্রিত হয়েও সোভিয়েত রাশিয়া এই অধিবেশনে
যোগদান করে নি। কিছু পূর্বে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে সোভিয়েত কূটনীতিবিদ
ভোরোভ্‌স্কি এক আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের

সঙ্গে সোভিয়েতের বিরোধের মীমাংসা হয় এবং ১৯২৭ সালের শারদীয় অধিবেশনে সোভিয়েত যোগদান করে। এবারে প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন লিটভিনভ। এর পরেও বহুবার লিটভিনভ সোভিয়েত প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করেছিলেন। লিটভিনভ বলশেভিক পার্টির একজন পুরনো সভ্য। ১৯০৫ সালের সুবিখ্যাত লণ্ডন কংগ্রেসে তিনি অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। লেনিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী লিটভিনভ জেনোয়া সম্মেলনে চিচেরিনের সহকারী হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বুঝবার বিষয়ে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেন। মস্কো সম্মেলনে তিনি সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন। অধুনা প্রসিদ্ধ 'যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা' গঠনে তাঁর ক্লান্তিহীন দৃঢ় প্রচেষ্টা ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে সুবিদিত। 'নিউ কেমব্রিজ হিষ্ট্রি'র লেখক লিখেছেন: জেনেভায় লীগের অনুশাসনের তাঁর মতো উৎসাহী প্রচারক আর কেউ ছিলেন না (*New Cambridge Modern History, Vol. XII*, পৃঃ ৪৮৯)। সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির প্রাক্কালে লিটভিনভের জায়গায় নিযুক্ত হন মলোটভ।

ই. এইচ. কার লিখেছেন, প্রস্তুতি কমিশনের শারদীয় অধিবেশন লিটভিনভের উপস্থিতিতে জীবন্ত হয়ে উঠল। ১৯২৭ সালের ৩০শে নভেম্বর লিটভিনভ কমিশনের চতুর্থ অধিবেশনে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর প্রস্তাবে সমস্ত স্থল, নৌ এবং বিমানবাহিনীর বিলোপ; সমস্ত মারণাত্মক অস্ত্র এবং যুদ্ধ-জাহাজের ধ্বংস; নৌ এবং বিমানঘাঁটির বিলোপ; যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কারখানার ধ্বংস; সরকারী বাজেটে সামরিক খাতে অর্থ বরাদ্দের অবসান প্রভৃতি দাবি করা হয়। এক বৎসরের মধ্যে, কিংবা পর্যায়ক্রমে চার বৎসরের মধ্যে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করবার সুপারিশ করা হয়। ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারেন না। জনগণের মধ্যে তখন যুদ্ধবিরোধী মনোভাব তীব্র এবং ক্রমবর্ধমান। তাঁরা কৌশলের আশ্রয় নেন এবং বলেন যে, প্রস্তুতি কমিশনের সামনে আলোচ্য বিষয় অস্ত্রহ্রাস, পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ নয়। এইভাবে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করা হয়। অবশ্য অস্ত্রহ্রাস সম্পর্কেও প্রধান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি একমত হতে পারে না। জার্মানির প্রতিনিধি বার্নস্টরফ জোরের সঙ্গে সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের দ্রুত অগ্রগতি দাবি করেন। জার্মান-আক্রমণের অতীত স্মৃতি ফ্রান্সের মনে জীবন্ত, ফ্রান্স আগাগোড়াই

'জাতীয় নিরাপত্তা'র দাবি জানায়। অবশেষে ১৯৩০ সালে একটা খসড়া প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে রাসায়নিক এবং জীবাণু-যুদ্ধ নিষিদ্ধ করবার সুপারিশ ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল না। ইটালি, জার্মানি এবং সোভিয়েত রাশিয়া খসড়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল।

অবশেষে ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বসে। বহু বৎসর এবং বহু সুযোগ ইতিমধ্যে নষ্ট হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ সম্মেলনের ব্যর্থতা ছিল অনিবার্য। ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানের যে সম্ভাবনা ছিল, ১৯৩২ সালে তা ছিল না। ইতিমধ্যে ঘটেছে বিশ্বঅর্থনৈতিক মন্দা (১৯২৯-৩২), যার আঘাতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিৎ কেঁপে উঠেছিল। ১৯৩১ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং পরের বৎসরে সাংঘাই-এর উপর বোমাবর্ষণ লীগের অনুশাসনকে ব্যঙ্গ করছিল। জার্মানিতে নাৎসি দলের উত্থান ছিল আর একটি ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা। ১৯৩০ সালের নির্বাচনে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি দল রাইখ্‌স্টাগে ১০৭টি আসন (ভোটসংখ্যা ৬৫ লক্ষ) লাভ করে, পূর্বের নির্বাচনে তার আসনসংখ্যা ছিল মাত্র ১২ (ভোটসংখ্যা ৮ লক্ষ)। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের এই ছিল পটভূমি।

নিখিল বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা যুক্তিতর্কের এক গোলকধাঁধা সৃষ্টি করলেন, লিটভিনভের ভাষায় বলা যায় "there was a complete lack of agreement on any single concrete proposal, and even on a general formula." ফ্রান্স একটা সশস্ত্র বাহিনী রাখবার প্রস্তাব করল, কোনো দেশ অন্য দেশকে আক্রমণ করলে এই বাহিনী তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। আমেরিকার প্রস্তাব ছিল—এক-তৃতীয়াংশ নিরস্ত্রীকরণ। ব্রিটেন এই প্রস্তাবের মধ্যে দেখতে পেল তার ক্রুইজার-বাহিনীর সংখ্যা কমানোর দুরভিসন্ধি। বৃটেনের পক্ষে সার জন সাইমন 'qualitative limitation'-এর প্রস্তাব দিলেন। সংখ্যাগত ভাবে অস্ত্র কমানো নয়, বিশেষ ধরনের 'আক্রমণাত্মক অস্ত্র' সম্পূর্ণ বিলোপ করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠল: 'আক্রমণাত্মক অস্ত্র'-র সংজ্ঞা কি? জার্মানি সমানাধিকারের দাবি তুলল; হয় ভার্সাই চুক্তিতে তাকে যেমন নিরস্ত্র করা হয়েছে, অন্যান্যদেরও তেমন করা হোক, কিংবা তাকে

পুনরস্ত্রসজ্জার অধিকার দেওয়া হোক। সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা লিটভিনভ ১৯৩২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি নতুন করে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব পেশ করলেন। লিটভিনভ বললেন:

> The idea of complete and general disarmament differs from all other schemes in its simplicity, practicability and effective control of its implementation.... Only complete disarmament can assure *equal security* and *equal conditions* for all the countries.

পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব ধনতান্ত্রিক দেশগুলি গ্রহণ করবে, এমন রঙিন আশা লিটভিনভের ছিল না। তিনি তাই শতকরা ৫০ ভাগ অস্ত্রসজ্জা হ্রাস, কয়েকটি বিশেষ ধরনের আক্রমণাত্মক অস্ত্রের (যেমন, ট্যাঙ্ক, দূরপাল্লার কামান, ভারি বোমারু জাহাজ) বিলোপ এবং সর্বপ্রকার রাসায়নিক এবং জীবাণুযুদ্ধের নিষিদ্ধকরণের দাবি করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব এবারও অগ্রাহ্য হয়।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। জার্মানিতে নাৎসি দল ক্ষমতা লাভ করেছে, যে দলের অন্যতম রণধ্বনি ছিল ভার্সাই চুক্তির বিরোধিতা। জার্মানি লীগ থেকে বেরিয়ে আসে এবং অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। ইতিপূর্বে জাপানও লীগ বর্জন করেছিল। মুসোলিনির নেতৃত্বে ইটালি অস্ত্রসজ্জার ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছিল।

যবনিকার আড়ালে আর একটা চক্র অবিরাম যুদ্ধচক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিল, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানার মালিকরা এই চক্রের নায়ক। ১৯১৩ সালে 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেনিন বিলাতের মেসার্স আর্মষ্ট্রং এণ্ড কোম্পানির অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের বিস্তীর্ণ ব্যবসার বিবরণ দিয়েছিলেন, উদারনৈতিক গ্ল্যাডস্টোনের উদারনৈতিক পুত্র ছিলেন এই কোম্পানির অন্যতম প্রধান মাতব্বর। পণ্ডিত নেহেরু এই চক্রের ভূমিকার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন: "এরা হচ্ছে নরহত্যার পাইকারি ব্যবসাদার; এদের মৃত্যুবর্ষী যন্ত্রপাতি এরা অপক্ষপাতে যে টাকা দেবে তাকেই বেচতে রাজি থাকে।... বিভিন্ন দেশের এই রণসজ্জা নির্মাণের কারখানাগুলোর পরস্পরের মধ্যে নিবিড় যোগ আছে। এরা দেশপ্রেমকে ক্ষেপিয়ে তুলে কাজ হাসিল করে, মৃত্যুকে নিয়েই এদের খেলা; এদের নিজেদের কারবার চালাবার বেলায় এরা ঘোর আন্তর্জাতিকতাবাদী—এদের নামই দেওয়া হয়েছে 'গুপ্ত আন্তর্জাতিক'।

নিরস্ত্রীকরণের কথায় এরা ঘোরতর আপত্তি তুলবে এ তো খুবই স্বাভাবিক। এদের গুপ্তচরেরা প্রত্যেক দেশের উর্ধতন কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক মহলে ঘোরাফেরা করেন।" জর্জ সেলড্‌স তাঁর *Iron Blood and Profits* বইতে আমেরিকার ডু পণ্ট, জার্মানির ক্রুপস্‌, ইংলণ্ডের ভাইকার্স প্রভৃতি দৈত্যকায় কোম্পানির কার্যকলাপের জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

এই চক্র আড়াল থেকে সুতো টানেন, আর রঙ্গমঞ্চে রাজনীতিবিদ পুতুলের মতো নাচেন। এই পুতুলনাচের ইতিকথা জানবার এখনও অনেক বাকি।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে অবশ্য অনেক সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের তখনও মীমাংসা হয় নি। আসলে এর অস্তিত্বই হয়ে পড়েছিল অবাস্তব। ১৯৩৪ সালের শেষে সম্মেলনের অধিবেশন ডাকা বন্ধ হলো। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অন্তিম মুহূর্তে লিটভিনভ প্রস্তাব করলেন, সম্মেলনকে একটি স্থায়ী শান্তি সম্মেলনে পরিণত করা হোক এবং নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে নিরাপত্তার প্রশ্ন আলোচিত হোক। ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের যুদ্ধের বাজনা শুরু হয়ে গেছে। পরিবর্তিত অবস্থায় নিরাপত্তার প্রশ্ন স্বভাবতই পুরোভাগে এসে পড়েছে। তখন থেকেই লিটভিনভের 'যৌথ নিরাপত্তা' নীতির শুরু।

এই প্রবন্ধের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে নিম্নলিখিত বই এবং পত্রিকা থেকে :
E. H. Carr : *International Relations between the Two world wars*, 1939.
G. M. Gathorne-Hardy : *A Short History of International Affairs*, 1939.
New Cambridge Modern History, vol. XII.
Nehru : *Glimpses of World History*.
New Times, No 11, 27, 28. [1962]
History of the Communist Party of the Soviet Union. [1960]

নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা

শ্যামল চক্রবর্তী

অবশেষে এ বছরের ১৫ই মার্চ তারিখে জেনিভায় নিরস্ত্রীকরণের বৈঠক আবার বসল : এ যেন অরক্ষণীয়া মেয়েকে পার করবার জন্যে বারে বারে কনে দেখাবার পালা। হৈ-চৈ করে বরপক্ষ কনে দেখতে আসছেন, পান-তামাক খাচ্ছেন, অনেক বড় বড় নীতিকথা আওড়াচ্ছেন, মেয়েকে যথা-অযথা অনেক প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে সভা ভঙ্গ করে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু কনে পছন্দও হয় না ; সম্বন্ধও পাকা হয় না।

১৯৪৬ সালের আণবিকশক্তি কমিশনের পর, ১৯৪৭ সালের প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র কমিশনের বিলোপ হয় ১৯৫০-এর জানুয়ারি মাসে।

১৯৫১ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি নিয়ে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধীয় এক কমিটি গঠন করে। এদের প্রস্তাব অনুযায়ী গঠিত হয় ঐ প্রতিনিধিদের নিয়েই এক নিরস্ত্রীকরণ কমিশন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এই কমিশন আলাপ-আলোচনা চালাল। এর পরে এলো দ্বাদশ শক্তির কমিশন এবং তার আবার পঞ্চশক্তির সাব-কমিটি ; চলল আরো কথা, আরো আলাপ। আবার চতুঃশক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রস্তাবে গড়া হলো দশ রাষ্ট্রের কমিশন, যার কার্যকাল ১৯৬০ সালের ১৫ই মার্চ থেকে ২৭শে জুন পর্যন্ত। তারপর আবার এই ৬২ সালের বৈঠক।

সম্প্রতি *U. S. News and World Report* হিসেব দিয়েছে যে ১৯৪৬ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত, এই ষোল বছরে, নিরস্ত্রীকরণের ওপর আন্তর্জাতিক বৈঠক হয়েছে ৮৬৩টি ; এতে ১৭০০০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করা হয়েছে এবং ১ কোটি ৮০ লক্ষ কথা উচ্চারিত হয়েছে।

বুকভাঙা কাহিনী, মনভাঙা কাহিনী ঘোষণা করছে এত সব বৈঠক ; [illegible]কারের Heart-Break House-এর গল্প।

মনে হচ্ছে, কনে দেখবার উপমা দিয়ে ভালো করি নি। কারণ, মেয়ের

বিয়ে না হলে যে ট্র্যাজেডি তা নিতান্তই একটি মেয়ে বা একটি পরিবা একান্ত নিজস্ব। কিন্তু যে ট্র্যাজেডির কথা আমি তুলেছি এখানে, কালো ছায়া আবৃত করেছে সারা দুনিয়ার মানুষকে। একটা প্রচণ্ড মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা। অতীতের সমস্ত ধ্বংসলীলাকে ছাপিয়ে মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনার সম্মুখীন আজ পৃথিবী, যেখানে পারমাণবিক প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই সমগ্র মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশ জ্বলে হয়ে যাবে; আর ছাই হবে বহু হাজার বছরের বহু পরিশ্রমে, বহু ভালোবা গড়ে তোলা মানবসভ্যতা। যারা বেঁচে থাকবে তারাও হয় অর্ধমৃত মৃত্যুর শীতল স্পর্শের জন্যে অপেক্ষা করবে, নয় মাটির গভীর তল আশ্রয় নেবে যেখানে পারমাণবিক বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়তা পৌঁছবে আর, আমাদের এই অতি পুরাতন, অতি পরিচিত, অতিপ্রিয় পৃথিবী, অবরোধে আবদ্ধ," "মেঘলোকে উধাও," "গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে নিমগ্না," "নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী," পড়ে থাকবে বীজাণু আর আরশোলাদের জন্যে—কারণ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সমগ্র প্রা জগতে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা সহ্য করবার ক্ষমতা ওদেরই সবচেয়ে বে জ্ঞানসাগরে জাল ফেলে তোলা কলসীর মুখ খুলে বেরিয়েছে যে জিন্, বাঁধতে পারলে প্রভূত সম্পদ লাভ হবে মানুষের, আর বাঁধতে না পারলে জিন্ই মানুষকে বিনাশ করবে।

ভালো হতো, যদি সত্যিই আরব্যোপন্যাসের গল্প হতো এটা। কিন্তু হলো কই? হিরোশিমা-নাগাসাকির ঘটনা ঘটল এই তো কয়েক বছর মাত্র আগে। তখন ছোট দুটো আণবিক বোমা মস্ত দুটো শহর করেছিল। আর আজ পারমাণবিক অস্ত্র তার বহুগুণ শক্তি নিয়ে ধ্বংস প্রতিযোগী দুই পক্ষের গোপন অস্ত্রাগারে যে পারমাণবিক অস্ত্র সঞ্চিত হয়ে বিশেষজ্ঞরা তার পরিমাপ জানিয়েছেন ২৫০,০০০ মেগাটন বা ২৫,০০০ টন টি. এন. টির সমান। অর্থাৎ, পৃথিবী নামক গ্রহের অধিবাসী মানুষ জন্য মাথা পিছু ৮০ টনের বেশি বিস্ফোরক জমা হয়ে রয়েছে ব্যবহারের উদ্দে

শুধু খাতার পাতায় কষে দেখানো হিসেব এ নয়; অস্ত্রগুলোও আলমারিতে তোলা নেই। যে কোনো মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য এ রয়েছে বিভিন্ন গোপন রকেট-উড্ডয়ন কেন্দ্রে, রয়েছে উড়ন্ত বিমানের রয়েছে সাগরের তলায় ভ্রাম্যমান ডুবোজাহাজে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের

নির্দেশের কয়েকমিনিটের মধ্যেই রকেট উড়বে, বোমা পড়বে, গোলা বর্ষিত হবে।

এমন প্রচণ্ড সর্বনাশ মাথায় নিয়ে এত কথা আর এত সময় অপচয় করে মানুষ কোন যুক্তিতে?

যুক্তি অবশ্য অনেক দেখানো হয়ে থাকে। তবে সে যুক্তিগুলির সারবত্তা বা অসারতা বিচার করতে গেলে বিশ্বরাজনীতির ওঠাপড়া এবং নিরস্ত্রীকরণের আলোচনার গতিপথের কিছুটা পরিক্রমা প্রয়োজন।

প্রথম মহাযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসলীলা যুদ্ধোত্তর মানুষকে চিন্তিত করে তুলেছিল; সুতরাং যুদ্ধের পরে স্থাপিত হয় জাতিসঙ্ঘ বা League of Nations। যার কভেন্যান্টের ভূমিকাতেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে জাতিসঙ্ঘে যোগদানকারিগণ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যুদ্ধ না করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ("the acceptance of obligations not to resort to war")। তারপর জাতিসঙ্ঘের আওতার ভিতরে ও বাইরে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে বহু আলোচনার পত্তন করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে সাফল্যের একমাত্র নিদর্শন দেখানো হয়ে থাকে ১৯২২ সালের ওয়াশিংটন নৌবাহিনী সীমিতকরণের চুক্তিটিকেও (Washington Naval Limitation Treaty of 1922); কিন্তু সে চুক্তিও আসলে যুদ্ধোত্তর বিশ্বে নৌশক্তি সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রিটেনের একচ্ছত্র আধিপত্য বিসর্জন ছাড়া আর কিছু নয়—অস্ত্রহ্রাস সম্বন্ধে তাতে কোনো উল্লেখই ছিল না। বরং এ পর্যায়ে সকলে অবাক হয়েছিল যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে ১৯২৭ সালে জেনিভায় নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তুতি কমিটিতে সর্বাত্মক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব আসে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ এ প্রস্তাবকে অবান্তর রসিকতা হিসাবে দ্রুত বর্জন করেন। আজও মনে পড়ে ডেভিড লো-র বিখ্যাত কার্টুন: আপাদমস্তক মধ্যযুগীয় নাইটের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমী শক্তিবর্গ বিরক্তিভরা ভ্রূকুঞ্চিত মুখে তাকিয়ে রয়েছেন চ্যাপলেইনের পোশাক পরা সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনভের দিকে, কারণ তিনি হাসিমুখে একটি অলিভপাতা ওদের বর্মের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে রীতিমতো সুড়সুড়ি দিচ্ছেন।

অবশ্য এরকম ঘটাই তখন স্বাভাবিক ছিল। কারণ মহাযুদ্ধের অবসানে

সদ্যোজাত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রত্যক্ষ বা হস্তক্ষেপের মারফতে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হলেও, বাকি পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া প্রভুত্ব। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা অসম্ভব ছিল। ব্যাপক মানব শান্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষা যৌথ নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব করে তুললেও, সে সমস্ত প্রয়াসকেই সাম্রাজ্যবাদীরা নিজ নিজ প্রচেষ্টায় বাগবিস্তারের নিরর্থক ধূম্রমণ্ডলীতে পর্যবসিত করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে কিন্তু কতকগুলি মৌলিক পরি গেছে। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ভিতর দিয়ে বিশ্বময় সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হওয়া দূরে থাক, সারা সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সামরিক শক্তি হিসাবে সে আবির্ভূ অগ্রগামী লালফৌজের নিরাপত্তা-বর্মের পেছনে পূর্ব ইওরোপের বিভি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমা আদর্শ বিশ্বময় অভূতপূর্ব সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। ওদিকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শক্তি-সূর্য অস্তমান। সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হিসাবে প্রাধান্য অর্জন করেছে মার্কিন যুক্তরা আগুনের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাগে নি তার মাটিতে; বিশ্বময় যুদ্ধাস্ত্র ও সরবরাহ করে সামরিক অর্থনৈতিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ক্ষমতা শিখরে তার অধিষ্ঠান নিশ্চিত করেছে; সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আণবিক অস্ত্রের উৎপাদন-কৌশল একমাত্র তারই জানা, হিরো নাগাসাকিতে তার ভয়াবহ ধ্বংসকারিতা সে ইতিমধ্যেই পরীক্ষা কর এই মহাবল পাশুপত অস্ত্রের একমাত্র অধিকারী হিসাবে বিশ্বময় নিয় ও প্রভাব বিস্তারে সে উন্মুখ।

বহু লক্ষ সন্তানের মৃত্যুতে কাতর, কামান বন্দুক ও রকেটে অস্থির, পোড়ামাটি ও প্রাসাদ-নগরীর ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে পৃথিবী তখন যুদ্ধবর্জিত শান্তিময় জীবনযাত্রার কামনায় অধীর। তাই আবার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations Organisation) এর নিরাপত্তা বজায় রাখার শুভ উদ্দেশ্য নিজ সনদে ঘোষণা করে। পূর্বানুসৃত ভ্রান্তির পুনরাবর্তন শুরু যাতে না হয়, সেজন্য গৃহীত হলো নিচয়ের ঐক্যমতের ভিত্তিতে কাজ করার নীতি। কারণ শুধুই

জোরে এদের ওপরে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে গেলে জাতিপুঞ্জে ভাঙন অনিবার্য এবং এরা একমত হয়ে শান্তি বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে যুদ্ধপ্রচেষ্টা বন্ধ করা সম্ভব।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, এই দুই ভিন্নধর্মী রাষ্ট্রের মত ও পথের বৈপরীত্য প্রথম থেকেই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। বিরোধ বাধল পূর্ব ইওরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন ও গ্রীসে ও অন্যত্র রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি যখন ফ্যাসিবাদ ও রাজতন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে সমাজের পুনর্গঠনের পক্ষে, বিশেষ করে, সাম্রাজ্যবাদের অবসান এনে জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সপক্ষে সহানুভূতি ও সমর্থন ঘোষণা করছে; তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাথী ও সাকরেদ ব্রিটেন ফ্রান্স হল্যাণ্ড বেলজিয়ামের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে মিতালির ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্র, প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উঠে পড়ে লেগেছে। দুই মতের সংঘর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

বিশ্বরাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এবার প্রতিক্রিয়াশীলতার আদর্শগত লক্ষ্যকে উপস্থাপিত করলেন মিঃ চার্চিল। ৫ই মার্চ, ১৯৪৬ সালে, তিনি তাঁর ফুলটন বক্তৃতায় বিশ্বময় কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক বিভীষিকাময় (?) ছবি এঁকে ঘোষণা করলেন যে সাম্যবাদকে প্রতিহত করবার জন্যে ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রশক্তি একটা "অনিশ্চিত, কম্পমান শক্তির ভারসাম্য" (quivering, precariou balance of power") সন্তুষ্ট না থেকে, অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রাধান্য স্থা করতে হবে।

তখন থেকে বিশ্বরাজনীতিতে যে যুগের শুরু হলো তাকে অভিহিত ক হয়েছে 'শীতযুদ্ধ'-এর যুগ বলে। শীতযুদ্ধ বলা হচ্ছে এই জন্যে যে ঠিক বিশ্ব বাধছে না বটে, তবে পৃথিবী বারবার এসে দাঁড়াচ্ছে যুদ্ধের ভয়াবহ গহ্বরে কিনারায়। দেখতে দেখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে যুদ্ধঘাঁটি বানি তুলতে লাগল; মানচিত্র দেখলে বোঝা যাবে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইওরোপের সীমানাকে ঘিরে ইওরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় সামরি ঘাঁটি দিয়ে বেষ্টিত করে ফেলা হয়েছে। সৃষ্টি হলো মার্কিন নেতৃত্বে উ আতলান্তিক চুক্তি সংগঠন বা NATO; তারিখ, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪ এর পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও এগিয়ে গেল দক্ষিণপূর্ব এ

চুক্তি সংগঠন (SEATO), মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংগঠন (MEDO, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে চুক্তি প্রভৃতির মারফৎ এক দুনিয়াজো চুক্তি-শৃঙ্খলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্পূর্ণ ঘিরে রাখতে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে স্বদেশে এবং যথাসম্ভব বিদে কমিউনিস্ট অনুসন্ধান ও বিতাড়নের নামে সর্বত্র মার্কিন রাজনীতির বিরো সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমাজচ্যুত ও অশক্ত করে রাখবার প্রয়া এ প্রচেষ্টা কুখ্যাত সিনেটার ম্যাকার্থির নামের সঙ্গে চিরতরে যুক্ত হ থাকবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকে চেষ্টা করে এসেছে নিজের প্রতি শক্তিকে উন্নত ও সংহত করে তুলতে; সমাজতান্ত্রিক মিত্ররাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্ ঘনিষ্ঠতর করে তুলতে, যার প্রত্যক্ষ ফল ওয়ারশ চুক্তি; এবং সাম্রাজ্যবা বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে মিত্রশক্তি বিচার করে নিয়মিতভা তার সমর্থন করতে।

১৯৪৬ সালে চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সম মধ্যে শীতযুদ্ধ একদিকে যেমন গুলি-গোলা বোমা-বারুদে অগ্নিময় হ বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে কোরিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায়, ভিয়েৎনামে, সুয়েজখাল তীরে, তেমনি অপরদিকে অন্য কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন ঘটে চলে ১৯৪৭-৪৮ সালের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম, সিংহল প্র স্বাধীনতা লাভ করেছে। ১৯৪৯ সালে চীনে গলিত চ্যাং-কাই-শেক শা ভেঙে নূতন সমাজতান্ত্রিক চীনরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার পরের বারো বছ প্রায় সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট অংশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতাপা থেকে মুক্ত হয়েছে। এমনকি ল্যাটিন আমেরিকাতেও কিউবা মার্কি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী প্রাধান্য থেকে মুক্তি ঘোষণা করেছে এবং সে ঘোষণা প্রতিধ্বনি উঠেছে ঐ মহাদেশের অন্যান্য অংশে। ফলে, শীতযুদ্ধের শক্তি সমাবে ভেঙে গেছে; বিশ্বরাজনীতিতে আর এক তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব ঘটেছে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের নামকরণ হয়েছে নিরপেক্ষ শক্তিসমূ Neutralist Powers। যুদ্ধে এদের আগ্রহ স্বভাবতই নেই; এরা চা শান্তির পরিবেশে থেকে দীর্ঘকালীন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবশ্যম্ভাবী ফল অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা থেকে দ্রুত অগ্রগতি।

পরিবর্তন আরও ঘটেছে:

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ সাল—সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাল।

১লা নভেম্বর, ১৯৫২ সাল—প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাল মার্কিন সামরিক কর্তৃত্বাধীনে।

২১শে আগস্ট, ১৯৫৩ সাল—পারমাণবিক বিস্ফোরণের রহস্য সোভিয়েতেরও করায়ত্ত।

গত দশ বছরে রকেট-বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে তার সর্বাধুনিক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া গেছে নিকোলায়েভ ও পোপোভিচের মহাকাশ-পরিক্রমায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও একেবারে পেছিয়ে নেই; ইতিমধ্যেই শেপার্ড ও কার্পেন্টার মহাকাশ ঘুরে এসেছেন। এর পাশাপাশি অবশ্য যুদ্ধাস্ত্র ও সমরসম্ভার সীমাহীন ভয়াবহতায় উন্নীত হয়েছে। ৫০, ১০০ বা ততোধিক মেগাটন বিস্ফোরক শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক অস্ত্র, আন্তর্মহাদেশীয় রকেট তো বটেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন জানাচ্ছেন যে গ্লোবাল রকেট বা রকেট-বিধ্বংসী-রকেটও তাঁদের করায়ত্ত।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত আণবিক ও পারমাণবিক শক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন প্রাধান্য ছিল, তা ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমনি আর নেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সর্ববিষয়ে তাদের সুনিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগোষ্ঠী বিভিন্ন বিষয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্য এবং শান্তির সপক্ষে তাদের সুনিশ্চিত মতবাদ জানিয়েছে।

পারমাণবিক শক্তির একচেটিয়া প্রাধান্য আজ কোনো পক্ষের নেই সত্যি, কিন্তু তা বলে যাঁরা প্রমাণ করতে চান যে বর্তমান বিভীষিকার ভারসাম্য বা Balance of Terror-এর জন্যই যুদ্ধ আর বাধবে না, তাঁরা সুখের স্বপ্ন দেখছেন। কারণ, এ ভারসাম্য সর্বদাই অস্থির; উভয়পক্ষই নিরন্তর চেষ্টা করছে এবং করবে ভারসাম্যকে নিজের পক্ষে টানতে। অতীতে শক্তির ভারসাম্য যেমন বারবার ভেঙে পড়ে যুদ্ধের আবর্তে পৃথিবীকে ডুবিয়েছিল, তেমনি বিভীষিকার ভারসাম্যও যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলতে বাধ্য। কঙ্গো থেকে লাওস, বার্লিন থেকে কিউবা পর্যন্ত বিস্তৃত বিরোধের উত্তপ্ত আবহাওয়ায়, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা ছাড়া শক্তিপ্রয়োগের পথ যতক্ষণ খোলা থাকবে, ততক্ষণ সামান্য স্ফুলিঙ্গ থেকে যে কোনো মুহূর্তে পারমাণবিক যুদ্ধের দাবানল জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা গভীরভাবে বর্তমান।

আর একদল লোক আছেন যাঁরা মনে করেন যে যুদ্ধ বাধবেই, ... উপায় নেই, সুতরাং হেসে নাও দু দিন বৈ তো নয়···

এটা ঠিকই যে সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্য বিসর্জন দেওয়ার বদলে যুদ্ধই ... করবে। কিন্তু মনের কামনা তাদের যাই হোক না কেন, এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে দুর্বল সাম্রাজ্যবাদ অনেক ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করতে বা যুদ্ধ চালাতে ... হয় নি; অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু জায়গায় তাকে ঔপনিবেশিক গ্রাস ... দিয়ে আসতে হয়েছে।

এও ঠিক যে যেসব সমরনায়ক যুদ্ধের মারফতে ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ও মর্যাদাবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছেন, তাঁরাও যুদ্ধ বাধাবার প্রচেষ্টাতেই সক্রিয় ... তেমনি সক্রিয় থাকবে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনে নিযুক্ত, অস্ত্রব্যবসায়ে মুনাফা ... সঞ্চয়ে ব্যস্ত, একচেটিয়া পুঁজিপতির দল। এই সমরনায়ক ও শিল্প... মিতালি থেকে যে ঝড়ের সঙ্কেত আসছে সে সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন ... কোনো সাম্যবাদী প্রচারবিদ নয়—স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ... বিদায়ী অভিভাষণে :

> This conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in American experience. The total influence—economic, political, even spiritual— is felt in every city, every state and every office of the federal government···In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for disastrous rise of misplaced power exists and will persist.

অবশ্য এ ছাড়াও আছে স্বল্পসংখ্যক রাজনীতির বিষবাষ্পে অন্ধ ... ব্যক্তি, যারা 'Better dead than Red' জিগির তুলে সোভিয়েতের ... যুদ্ধের সপক্ষে জনমত সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমরাস্ত্র ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত মুনাফা করবার ... নেই। দুনিয়াময় যুদ্ধ ঘাঁটি তাদের ছড়ানো নেই। ওখানে আইন ... করা হয়েছে যুদ্ধপ্রচারের বিরুদ্ধে। এজন্য নয় যে ভয়াবহ যুদ্ধপ্রচার ... এবং আইনের সাহায্যে সে প্রচার দমন করতে হয়, বরং, সব দেশেই ...

সপক্ষে প্রচার আইনের চোখে অপরাধ হিসাবে দণ্ডনীয় হওয়া উচিত, তারই উদাহরণ স্থাপন এ-আইনের উদ্দেশ্য। সোভিয়েত দেশের মানুষের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মৃত্যু আর ধ্বংসের ভিতরে যে চূড়ান্ত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না সারা দুনিয়ায়। সোভিয়েতের মানুষ যুদ্ধ চায় না, শান্তিতে বাঁচতে চায়—এ সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন সকলেই, যাঁরা নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘুরে এসেছেন অথবা সোভিয়েতের মানুষজনের সঙ্গে মিশেছেন।

কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ, যদি সর্বশ্রেষ্ঠ নাই হয়, সমরাস্ত্রসজ্জিত রাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অতবার না হলেও, বারবার পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, যার কুফলও ব্যাপক।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কৈফিয়ৎ হলো : আমাদের দেশকে চারিদিকে যুদ্ধ ঘাঁটিতে ঘিরে রাখা হয়েছে; একটার পর একটা সামরিক চুক্তি গড়া হয়েছে আমাদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী শক্তির দায়িত্বশীল রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ বারেবারে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুংকার তুলেছেন ও তুলছেন; আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য নিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত ডুবোজাহাজ ঘুরছে সাগরে, আকাশে উড়ছে বিমান; ন্যাটো-চুক্তি দ্বারা গঠিত সামরিক বাহিনী পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মহড়া দিচ্ছে আমাদের সীমানার অপর পারে; আমাদের সামরিক গোপনীয়তা ভেদ করবার জন্য গোয়েন্দাগিরির জটিল জাল ছড়ানো হয়েছে; এ অবস্থায় নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্যই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হয়েছে; এবং, এতদিন যে যুদ্ধ বাধে নি তার নানা কারণের মধ্যে অন্যতম কারণও হলো যে আমরা যথেষ্ট বলশালী।

আবার এ কথাও সত্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের যুদ্ধের সঙ্গে কোনো স্বার্থসম্বন্ধ নেই; তাঁরাও যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। তবুও এ সব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা নিজ নিজ রাষ্ট্রের অস্ত্রসজ্জা ও সমরমুখী নীতি সমর্থন করে আসছে।

জিজ্ঞেস করলে এরা বলবে : আমরা যুদ্ধ চাই না; সোভিয়েত দেশ নিজের মতে চলুক তাতে আমাদের আপত্তি নেই; কিন্তু আসলে আমরা তাদের বিশ্বাস করি না। প্রচণ্ড ধ্বংসকারী পারমাণবিক অস্ত্র ওদের হাতে

ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক স্থলবাহিনী ওদেরই ; লালফৌজের উপস্থিতি না থাকলে পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র আসত না, সাম্যবাদীরা শাসন চালাতে পারত না ; চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গারি বা জার্মানির ইতিহাস হতো অন্যরকম ; কমিউনিস্ট শাসন কায়েম করবার জন্য কোরিয়া বা তিব্বতে চীনা সৈন্য অস্ত্র হাতে নেমেছে ; ঐ একই উদ্দেশ্যে ওরা ফের অন্য দেশে এই কাজে লাগবে। এ অবস্থায় আমাদের নেতারা নিরস্ত্রীকরণের যে সব শর্ত দিচ্ছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন তা মেনে নেয়, ভালো ; নিরস্ত্রীকরণ হবে, নইলে নিরুপায়।

এদের সন্দেহ যথার্থ কি না সে প্রশ্ন অবান্তর। ঘটনা হলো, এ সন্দেহ তারা সত্যই পোষণ করে।

এটা খুব পরিষ্কার করে বোঝা দরকার যে, উভয়পক্ষের অপরের সম্বন্ধে গভীর আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে নিরস্ত্রীকরণের কোনো প্রস্তাব কার্যকরী হতে পারে না। সুতরাং, সেই প্রস্তাবেরই ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা রয়েছে যাতে নিরস্ত্রীকরণ চলে সমান তালে, কোনো পক্ষকেই অপরের তুলনায় বেশি সুযোগ না দিয়ে।

কিন্তু এমন ফর্মূলা যদি বার করাও যায়, তবে নিরস্ত্রীকরণের আলোচনার দায়িত্ব যাদের হাতে, তারা কি সে প্রস্তাব মানবে।

সামরিক বিশেষজ্ঞ আর পেশাদার কূটনীতিক, যাঁদের অনেকেরই টিকি বাঁধা আছে একচেটিয়া যুদ্ধশিল্পের সঙ্গে, যদি একমাত্র দায়িত্বে থাকেন, তাহলে নিরস্ত্রীকরণ ঘটবে 'না কোনদিনও। সাধারণ মানুষের হস্তক্ষেপ যদি ঘটে, তাহলে যুদ্ধবিহীন পৃথিবী সৃষ্টি সম্ভব।

দুনিয়াটা বদলেছে অনেক। একদিন ছিল, যখন কর্ম হতো কেবল কর্তার ইচ্ছায়। এখন বাচ্যের পরিবর্তন ঘটছে ; কর্মকারকরাও কর্তৃকারক হয়ে বসছে।

অথচ তা যে ঘটবেই, একথা হলফ করে বলা যায় না। মানুষকে বাঁচতে গেলে যুদ্ধকে মারতে হবে। এ যুগে যুদ্ধ আর নিয়তির মতো দুর্বার নয়, তেমনি নিয়তির মতো অনিবার্য নয় শান্তি।

> "Mankind can and must live without war. War in the contemporary epoch is not fatally inevitable. But neither is peace fatally inevitable."—বলেছেন খ্রুশ্চেভ্।

অথচ বিপদ বাড়ছে দিনে দিনে। পারমাণবিক অস্ত্র নতুন নতুন রাষ্ট্রের হাতে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। ফলে, তার নিয়ন্ত্রণের সমস্যাও হয়ে উঠেছে আরও কঠিন। ছোটখাট যুদ্ধ থেকে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনা বাড়ছে। ফ্রান্সে O. A. S. বিদ্রোহ যে রূপ নিয়েছিল, তাতে সেনাবাহিনীর হাতে যথেষ্ট পরিমাণে আণবিক ও পারমাণবিক অস্ত্র ছড়ানো থাকলে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যাওয়ায় আশ্চর্যের কিছু ছিল না। পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে যে সব বিমান উড়ছে তাদের কোনো এক দুর্ঘটনার ফল মারাত্মক হতে পারে। এই তো ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিন Strategic Air Command-এর অধিনায়ক জেনারেল পাওয়ার Radar-এর ভুল নির্দেশে সমস্ত মার্কিন ঘাঁটি থেকে সমস্ত বোমারু বিমান পাঠিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে। তারা এগিয়েছিল পুরো বারো মিনিট ধরে। পরে ভুল ধরা পড়ায় তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু যদি ভুল ধরা পড়তে দেরি হতো, যদি রকেট উড়ত তার আগেই,···

নষ্ট করার মতো সময় মোটে নেই। বিপর্যয় ঘটবার আগেই উভয় পক্ষেরই আক্রমণ করার বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে হবে একই সঙ্গে। আর নিরাপত্তা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে যথোপযুক্ত তদারকির।

এই পটভূমিকাতেই বিচার করতে হবে সতেরো রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের জেনিভায় বৈঠক ও তার প্রস্তাবাদি।

ইতিপূর্বে এক কোটি আশি লক্ষ কথার ফুলঝুরি জ্বললেও সবটাই বৃথা হয় নি। নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেকটা ঐক্যমতে পৌছনো গেছে ; নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাকে অনেকখানি সীমাবদ্ধ করে কয়েকটা বিশেষ বিষয়ে নিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের চতুর্দশ অধিবেশনে সর্বাত্মক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

১৯৬১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ষোড়শ অধিবেশনের সামনে সোভিয়েত ও মার্কিন যুগ্ম-রিপোর্ট পেশ করা হয়, যাতে তাঁরা ঐক্যমতের ভিত্তিতে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে আলোচনার মূল নীতিগুলি উপস্থাপিত করেন।

এ আশঙ্কা দীর্ঘকাল থেকেই বেশ কিছু সংখ্যক লোকের মনে ছিল যে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কতকগুলি ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতি সমরসজ্জার সঙ্গে এমন জড়িয়ে গেছে যে নিরস্ত্রীকরণ ঘটলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় অনিবার্য। কিন্তু সতেরো রাষ্ট্রের বৈঠকের সামান্য কিছু আগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল 'নিরস্ত্রীকরণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল' নামে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন তাতে পরিষ্কার করে ঘোষণা করা হয়েছে যে যুদ্ধের পরে মন্দা এড়িয়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন যেভাবে সম্ভব হয়েছিল, নিরস্ত্রীকরণের পরেও শান্তির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনেও তেমনি মন্দা এড়ানো যাবে; উপরন্তু এ অবস্থায় অর্থনৈতিক বিকাশ হবে অনেক ব্যাপক ও বিস্ময়কর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে এই রিপোর্টে একমত হয়ে স্বাক্ষর দিয়েছেন অন্যান্যদের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি।

বৈঠকের সদস্যদের চরিত্রও পাল্টেছে। প্রথম দিকে বৈঠক বসত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের সঙ্গে ক্যানাডাকে নিয়ে। অর্থাৎ, একদিকে সাতটি পশ্চিমী শক্তি, অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৬০ সালে দশ জাতির বৈঠকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে পূর্ব ইওরোপীয় আরও চারটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থান হলো। এবারে উপরোক্তদের সঙ্গে আসন পেয়েছে ব্রেজিল, ব্রহ্ম, ইথিওপিয়া, ভারত, মেক্সিকো, নাইজিরিয়া, সুইডেন ও সংযুক্ত আরব রিপাবলিক। অর্থাৎ, নিরপেক্ষ শক্তিগোষ্ঠীর কার্যকরী অবদান রাখবার সুযোগ ঘটেছে এখানে।

কিন্তু দুর্লক্ষণেরও অভাব ছিল না। জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব ছিল আঠেরো জাতির বৈঠক করানো। কিন্তু ফ্রান্স বলল এ বৈঠকে তারা যোগ দেবে না। ফ্রান্স সাহারায় আণবিক পরীক্ষা চালাচ্ছে; ফ্রান্স ন্যাটো যুদ্ধজোটের অন্যতম পাণ্ডা; সেই ফ্রান্সকে বাদ দিয়ে নিরস্ত্রীকরণ হয় না। অবশ্য তেমনি হয় না চীনকে বাদ দিয়ে; অথচ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিদের ফলে আজ পর্যন্ত জাতিপুঞ্জে চীনের স্থান করানো গেল না। উপরন্তু আলোচনা শুরু হবার আগে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী খ্রুশ্চেভ প্রস্তাব করেছিলেন যে নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা হোক রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে; কারণ, তাঁরাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। কিন্তু সে প্রস্তাব মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বাতিল করে দিয়েছেন। বৃহত্তম অশুভ ইঙ্গিত নিয়ে দেখা দিল নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের সময়সূচীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রিস্টমাস দ্বীপে মার্কিন পারমাণবিক পরীক্ষার

পুনরারম্ভ, যে পরীক্ষামালায় সব চেয়ে বড় অন্যায় হলো মহাকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো। অথচ, এই বিস্ফোরণের প্রস্তাবেই সারা পৃথিবীতে, এমন কি খ্যাতনামা ইংরাজ ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের ভিতর থেকেই তীব্র আপত্তি ঘোষিত হয়েছিল।

সুতরাং শুরুতেই সন্দেহ করার কারণ ছিল যে এ বৈঠক থেকে ফলপ্রসূ কিছু পাওয়া যাবে না।

জেনিভায় সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে প্রস্তাব রাখা হলো সর্বাত্মক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের। এ প্রস্তাবের মূল বক্তব্য হলো নিম্নরূপ:

> সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ করা হবে তিনটি পর্যায়ে; প্রতি পর্যায়েই দেখা হবে যে কোনো এক পক্ষ যেন বিশেষ সামরিক সুবিধা না পায়; এই তিন পর্যায় সমাপ্ত করা হবে চার বৎসরের মধ্যে; প্রতি পর্যায়েই নিরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথোপযুক্ত তদারকির ব্যবস্থা থাকবে। সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের তাৎপর্য হলো, সমস্ত সামরিক বাহিনী ভেঙে ফেলা হবে; সব রকমের অস্ত্র বাতিল করা হবে; বিদেশে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটিগুলিকে বিনষ্ট করা হবে; বিদেশে প্রেরিত সৈন্যদল ফিরিয়ে আনতে হবে; আণবিক, পারমাণবিক, রাসায়নিক, বীজাণু-ঘটিত ও তেজস্ক্রিয়-অস্ত্রের মজুত ধ্বংস করা হবে, উৎপাদন বন্ধ করা হবে; কনস্ক্রিপশন বন্ধ থাকবে, সাধারণের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হবে না; যুদ্ধ দপ্তর তুলে দেওয়া হবে, জেনারেল স্টাফ বাতিল করা হবে, সামরিক বাহিনীর জন্য বিশাল অর্থবরাদ্দ বন্ধ করা হবে। থাকবে শুধু— আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা দমনের প্রয়োজনে ও জাতিপুঞ্জের আহ্বানে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে হাল্কা গুলি-গোলায় সজ্জিত শান্তিরক্ষা বাহিনী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রথম পর্যায়ের দায়িত্ব। বলা হচ্ছে, প্রথম পর্যায়েই, অর্থাৎ, ১৫ মাসের মধ্যে অপরের উপর পারমাণবিক অস্ত্র হানবার সব রকমের ব্যবস্থা ও বিদেশে অবস্থিত যুদ্ধ ঘাঁটিগুলি বরবাদ করতে হবে এবং সামরিক বাহিনী ও প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র কমিয়ে আনতে হবে। বিস্তারিত বললে দাঁড়ায়, পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত সব রকমের রকেট, সামরিক বিমান, যুদ্ধজাহাজ, ডুবোজাহাজ, পারমাণবিক গোলা ছোঁড়বার দূর পাল্লার ভারি কামান, বাতিল করতে হবে। এগুলির মজুত নষ্ট করতে হবে; আর উৎপাদন করা চলবে না। পাশাপাশি বিদেশে

অবস্থিত সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে আনতে হবে, তাদের যুদ্ধ ঘাঁটিগুলি নষ্ট করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, উভয়েরই সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত জনশক্তিকে ১৭ লক্ষে নামিয়ে আনতে হবে, বাড়তি প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করতে হবে, প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনেও নিয়ন্ত্রণ বসাতে হবে, সামরিক ব্যয়বরাদ্দ কমাতে হবে। মহাকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো চলবে না, মহাকাশে রকেট পাঠানো হবে নিতান্তই শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে। অন্য কোনো দেশকে পারমাণবিক অস্ত্র সরবরাহ করা চলবে না; পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করতে হবে। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব বাহিনীর ভিত্তিতে জাতিপুঞ্জের শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষার ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করতে হবে। সমস্ত ব্যবস্থাগুলির তদারকির জন্য আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা (International Disarmament Organisation) গঠিত হবে; এরা তদারকির কার্যে নিযুক্ত অফিসারদের মারফতে কাজ করবে।

প্রথম পর্যায়ের এই কাজগুলির ভিত্তিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ সফল করা হবে।

লক্ষ্য করা দরকার যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সহযোগী পশ্চিমী রাষ্ট্রবৃন্দ শুধু সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যই মেনে নিয়েছেন। তাঁরাও মনে করেন জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে হাল্কা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শান্তিরক্ষা বাহিনী থাকা দরকার। আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা গড়বার ব্যাপারে তাঁরাও একমত। তাঁরা মানেন যে প্রথম পর্যায়েই মহাকাশে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন এবং রকেট পাঠানোর সংবাদ সকলকে আগে থেকে জানানো দরকার। তাঁরা স্বীকার করেন প্রথম পর্যায়েই নতুন কোনো রাষ্ট্রকে পারমাণবিক অস্ত্র সরবরাহ করা বন্ধ করা উচিত এবং সকলেই একমত যে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি যদি স্বতন্ত্রভাবে আগে থেকে করা সম্ভব না হয়, তাহলেও সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির প্রথম পর্যায়েই তাকে স্থান দিতে হবে।

কিন্তু দুই পক্ষের ফারাকগুলো নজর করা উচিত আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

প্রথমেই মতান্তর সময়ের প্রশ্নে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বলছে, প্রথম দুই পর্যায় হবে প্রত্যেকটি ১৫ মাসের করে এবং এক পর্যায় থেকে অপর পর্যায়ে হাজির হতে ও সমগ্র নিরস্ত্রীকরণ সঙ্গে করতে লাগবে মোট চারবছর। মার্কিন বক্তব্য হলো, প্রথম দুটি পর্যায়েই লাগবে প্রত্যেকটি আড়াই বছর করে

পাঁচ বছর, এবং তৃতীয় পর্যায়ে যে কত সময় লাগবে তার কোনো হদিস তাঁরা দিচ্ছেন না।

দ্বিতীয় পার্থক্যটি আরও গভীর। সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে বলছে যে প্রথম পর্যায়েই পরদেশ আক্রমণ, বিশেষ করে আকস্মিক আক্রমণের, মূলে আঘাত করা প্রয়োজন; সেখানে মার্কিন পক্ষ আপত্তি তুলছে যে পারস্পরিক বিশ্বাস আনতে হবে ধীরে ধীরে; সেইজন্য তাদের মতে প্রথম পর্যায়ে শুধু শতকরা ত্রিশভাগ অস্ত্রশক্তি বাতিল করলে চলবে এবং বিদেশে অবস্থিত ঘাঁটি বাতিল করতে তারা রাজি শুধু তৃতীয়, অর্থাৎ, শেষ পর্যায়ে।

তৃতীয় দফা মতান্তর সমান গুরুতর। সোভিয়েত ইউনিয়নের বক্তব্য নিরস্ত্রীকরণ যতখানি হলো, অর্থাৎ যে অস্ত্রশস্ত্র বিনষ্ট করা হলো বা অস্ত্র উৎপাদন যে বন্ধ করা হলো, এর সম্বন্ধেই তদারকি চলবে। মার্কিন পক্ষ দাবি করছে যে কার, কোনখানে, কতখানি অস্ত্র রইল সে সম্বন্ধেও তদারকি চালাতে হবে।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা সম্বন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত হলো যে এর কার্যকরী শান্তিরক্ষাবাহিনী আসবে জাতীয় নিরাপত্তাবাহিনী থেকে এবং এর কাজকর্ম চলবে ঐক্যমতের নীতির ভিত্তিতে; সে জায়গায় মার্কিন চাহিদা হলো যে এই নিরাপত্তাবাহিনী স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে গড়ে উঠবে এবং তার কাজ চলবে সংস্থার সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে।

বিস্তারিত প্রস্তাবে মতপার্থক্য আরও প্রচুর রয়েছে; কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে এই কটিকেই আগে নেওয়া গেল। প্রথম তিনটি পার্থক্যকে এক সঙ্গে ধরলে বিষয়ের গুরুত্বটা বোঝা যাবে। আজকে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র যে পরিমাণ মজুত রয়েছে উভয়ের অস্ত্রাগারে, তার সামান্য ভগ্নাংশ দিয়েও পৃথিবীতে প্রলয় বাধানো যায়। এ অবস্থায় শতকরা ত্রিশভাগ অস্ত্রবর্জনে আক্রমণের আশঙ্কা বিন্দুমাত্রও কমবে না। উপরন্তু নিরস্ত্রীকরণের কার্যক্রমকে যত দীর্ঘস্থায়ী করা যাবে, ছোটখাট নানা বিষয়ে মতপার্থক্য ততই দেখা দেবে; সমস্ত প্রচেষ্টা বানচাল হবার সম্ভাবনা ততই বাড়বে। সুতরাং এরকম সম্ভাবনাকে সামনে রেখে সামগ্রিক তদারকির প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন কিছুতেই মানতে রাজি হবে না। কারণ, তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রক্ষাকবচ হলো গোপনীয়তা। যে কোনো সময়েই, আকস্মিক আক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা

থাকলে, নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অপরপক্ষের তদারকিতে
দেবে, এ অবস্থা কিছুতেই কল্পনা করা যায় না।

মার্কিন পক্ষ বলছে, তোমাদের বিশ্বাস করি না! উত্তরে বলা
মুখের কথা বিশ্বাস করার দরকার কি? আকস্মিক আক্রমণের
নষ্ট যদি উভয় পক্ষই করে, তবে সে কাজটা মৌখিক প্রতিশ্রুতির চেয়ে
জোরদার নয় কি? আর সোভিয়েত তার রকেট অস্ত্র বিসর্জন দেবে,
করলে, স্বভাবতই বিদেশে অবস্থিত যুদ্ধঘাঁটিগুলো তুলে আনা যুক্তি
নয় কি?

তাছাড়া, তদারকি ব্যবস্থা সম্বন্ধে বর্তমান সোভিয়েত প্রস্তাব
করে তোলা যায় না, এ কথা সোভিয়েত ইউনিয়নও বলবে না। এটা
খসড়া-প্রস্তাব, চরমপত্র নয়। কিন্তু তদারকিকে উন্নত করতে গেলে
বিষদাঁত উপড়োবার দায়িত্বও নিতে হবে।

প্রচারের ধূম্রজালের মধ্যে আসল কথাটা ভুললে চলবে না।
বৈঠক, আলোচনা, সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে দেওয়া আর নেওয়া।
কোট নিয়ে বসে থাকলে মীমাংসা হবে না। কিন্তু অপরপক্ষকে
চালাকি করে কার্যসিদ্ধ করে নেওয়ার কল্পনাও বাতুলতা।

সতেরো জাতির নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক চলল মার্চ থেকে আগস্ট
এর মধ্যে একবার দুই মাসের বিরতি হয়ে গেছে। আর একবার বিরতি
চলল। এর মধ্যে কোনো বিষয়েই মীমাংসা করা যায় নি।

এত বড় বিষয়ে দ্রুত কিছু হয়ে যাবে, এতটা আশাবাদ হয়তো
ছিল না। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ না হোক, পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি,
অঞ্চল গঠন, মহাকাশে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত—এরকম
তো ঘটতে পারত!

এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান এসেছিল ভারত প্রভৃতি
রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে। এদের প্রস্তাব ছিল: আজকের দিনে
দেশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ অপরদেশে নিজস্ব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
মারফতই ধরা যায়। সুতরাং সন্দেহ জাগাবার কারণ যেখানে
সেখানে, নিরপেক্ষদের দ্বারা, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আমন্ত্রণে, তদারকি
করা যেতে পারে। সাধারণভাবে তদারকি সর্বনিম্নপর্যায়ে আবদ্ধ

সংগত। সুতরাং এরকম তদারকির ভিত্তিতে পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি করা সম্ভব।

নিরপেক্ষদের এ প্রস্তাব উভয় পক্ষই বিচারযোগ্য বলে জানান। গত ১৩ই জুলাই মস্কোর সংবাদে প্রকাশ যে সোভিয়েত সরকার এ প্রস্তাবকে চুক্তির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। পশ্চিমী বিরোধিতা এখনও অনড়।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল মানুষ নিরপেক্ষদের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন পরীক্ষাবন্ধের ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি হিসাবে। তবু জেনিভায় তা গৃহীত হয় নি।

কিছু যে হয় নি—সে কথা বলেই এ কাহিনী শেষ করা যেত। কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। কিছু যে হয়েছে, তাও মনে রাখা দরকার। সন্দেহে বা হতাশায় অন্ধমন নিয়ে না দেখলে, দেখা যাবে যে উভয়পক্ষের ন্যায্য সন্দেহ দূর করার বাস্তব ভিত্তির দিকে অনেকখানি এগোনো গেছে ও যাচ্ছে। ব্রিটেন, আমেরিকা থেকে আরম্ভ করে বিশ্বময় নির্দলীয় সাধারণ মানুষ আজ অনেক বেশি আগ্রহ ও দায়িত্ব নিয়ে শান্তির পক্ষে মুখর হয়েছে, কার্যকরী পদ্ধতি নেবার দিকে চলেছে। শান্তি অনিবার্য না হলেও, যুদ্ধও অনিবার্য নয়; শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সময়ের সঙ্গে দৌড়ে সাধারণ মানুষের সক্রিয়তা জিততে পারবে কি না, তার ওপরেই যুদ্ধ বা শান্তির শেষ মীমাংসা নির্ভর করছে।

নিরস্ত্রীকরণ ও অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস

বিপ্লব দাশগুপ্ত

কথায় আছে, "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।" বিগত ত্রি দশকের প্রথমভাগে সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের পর পুঁজিবাদী দেশগুলি মনোভাবও প্রায় একই রকম। এই মন্দাবাজারের ঢেউয়ে সবচেয়ে বে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পাশ্চাত্যকুলের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ১৯৩৩ সা ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মুহূর্তেও শতকরা পঁচিশ ভাগ লোকে কোনো কাজ ছিল না, সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য ছিল স্বাভাবিক অবস্থার থে শতকরা ষাট ভাগ নিচে, এবং একমাত্র ১৯৩২ সালেই ১৪০০ ব্যাঙ্ক সমগ্র মার্কি যুক্তরাষ্ট্রে বন্ধ হয়ে যায়। সর্বোপরি এই মন্দাবাজার সনাতন পুঁজিবা অর্থনীতির মূলতত্ত্বগুলিকে অবাস্তব প্রমাণিত করে এবং পুঁজিবাদী ব্যব অবসানের সম্ভাবনাকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। ইতিহাসের সে যুগসন্ধিক্ষণে পুঁজিবাদ কোনোরকমে সেই প্রচণ্ড ধাক্কা সামলে নেয় সনাত পুঁজিবাদী অর্থনীতির তত্ত্বে ও বাস্তব প্রয়োগে অনেকগুলি বড় রকমের সংশো করে এবং শক্তিমান সরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে—যা পুঁজিবাদী ধারণায় ইতিপূ অন্যায় বলে মনে করা হতো। কিন্তু এই গোঁজামিলের ভিত্তি যে খুব শক্ত ন তার প্রমাণ মেলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে কয়েক ব অন্তর নিয়মিতভাবেই এক একটি মন্দাবাজারের ঢেউ সংকটকে তীব্রতর ক তুলছে। ক্রমবর্ধমান বেকারসমস্যা এবং কার্যকরী চাহিদা হ্রাসের সমস্যার কো স্থায়ী সমাধান যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্ভব নয়, একথা স্পষ্টতই উপল করেছেন অর্থনীতিবিদরা। তাই যে কোনো অর্থনৈতিক সংকটের হ্রা তাঁদের ভীত এবং সন্ত্রস্ত করে তুলছে এবং পুঁজিবাদের সমূহ বিনাশের আশ তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠছেন। শেয়ার বাজারের দর একটু কমতে সুরু কর তাঁদের স্মরণে আসে ১৯২৯ সালের 'শেয়ার বাজারের সংকট'-এর কথা এবং স ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় প্রায় একযোগে 'ব্ল্যাক মন্ডে' বা অন্য কিছু নিয়ে সোরগো পড়ে যায়।

নিরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে ওঁদের আপত্তির কারণও ঠিক তাই। নিরস্ত্রীকরণের ফলে যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত প্রচুর দ্রব্য সম্পদ এবং মানুষ অকেজো হয়ে পড়বে; যার ফলে অতি উৎপাদন, বেকার সমস্যা এবং কার্যকরী চাহিদাহ্রাস ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হবে এবং এই রকম সংকটের সমাধান পুঁজিবাদ করতে পারবে না। এই যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন মার্কিন সমরবিদরা এবং যুদ্ধোপকরণ ব্যবসায়ীরা, যাঁরা এই নিরস্ত্রীকরণের ফলে আঘাত পাবেন সবচেয়ে বেশি। নানাভাবে অজস্র অর্থ ছড়িয়ে তাঁরা এই যুক্তির প্রচার করছেন এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে নিরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে একটি বাঙ্ময় জনমত তৈরি করে তুলেছেন। সরকারের ওপরও এঁদের প্রভাব অসীম। তাই প্রতিটি নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় নানা সূক্ষ্ম এবং জটিল তর্ক ও কূটতর্কের জালে তাঁরা জড়িয়ে ফেলছেন বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে এবং প্রাণপণে নিরস্ত্রীকরণের সহজ ও সরল সমাধানের পথটি আটকে রাখছেন। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, এই আশঙ্কা কতটুকু সত্য এবং মন্দাবাজারের সম্ভাবনা এড়িয়ে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব কিনা।

অনুন্নত অর্থনীতি ও নিরস্ত্রীকরণ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিকে আমরা উন্নত এবং অনুন্নত—এই দুইভাগে বিভক্ত করতে পারি অর্থনীতির বিচারে। উন্নত দেশগুলির আলোচনায় পরে আসছি, অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা খুব জটিল বা সমাধান-বহির্ভূত নয়। অনুন্নত দেশগুলির—কি ধনতান্ত্রিক কি সমাজতান্ত্রিক—একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধনের অভাব। এসব দেশে সাধারণত খনিজ বা প্রাকৃতিক অন্যান্য সম্পদের অভাব বিশেষ প্রকট নয়, জনসম্পদও প্রয়োজনানুগ, কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক বা জনসম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না মূলধনের অভাবে। অথচ প্রাথমিকভাবে যদি কিছু মূলধন পাওয়া যায়, তার ব্যবহার জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে অনেকখানি, অনেক মানুষের কর্মসংস্থানে সহায়ক হয় এবং সর্বমোট ক্রয় শক্তি বৃদ্ধি করে জিনিসপত্রের কার্যকরী চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। এই বর্ধিত কার্যকরী চাহিদা আবার উৎপাদন, কর্ম ও ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে লগ্নিকৃত পুঁজির বেশ কয়েকগুণ বেশি জাতীয়সম্পদ তৈরি হতে পারে এর ফলে। এই পুঁজির অভাবে এদের হাত পাততে হয় বিদেশে এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অনেকখানি বহুক্ষেত্রে খর্ব হয় এর ফলে।

নিরস্ত্রীকরণ অনুন্নত দেশগুলির পুঁজির অভাব পূর্ণ করতে পারে। গরীব হওয়া সত্ত্বেও স্নায়ুযুদ্ধের চাপে সমরোদ্যোগ এদের করতে হয় অনেকখানি এবং জাতীয় আয়ের এক বড় পরিমাণ অপচয় ঘটে অস্ত্রসজ্জায় এবং যুদ্ধপ্রস্তুতির কাজে। নিরস্ত্রীকরণ এই অপচয় রোধ করবে এবং যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যয় হচ্ছে, তার প্রায় সবটুকু জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের জন্যে প্রয়োগ করা যাবে। এর ফলে বিদেশীনির্ভরতা কমবে এবং দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে সুসংগঠিত করে তোলা যাবে।

অবশ্য একটি নতুন অসুবিধা এর ফলে সৃষ্টি হতে পারে। বিদেশের বাজারে এই অনুন্নত দেশগুলির প্রধান বিক্রয়সামগ্রী হলো কৃষিপণ্য। নিরস্ত্রীকরণ সম্পূর্ণ হলে উন্নত দেশগুলি এখন কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে নিজেদের চাহিদা অনেকখানি নিজের বাজার থেকেই মিটিয়ে নেবে, যেহেতু মূলধনের এক বড় অংশ এখন ওই প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখব, নিরস্ত্রীকরণের ফলে অনুন্নত দেশে উন্নত দেশগুলির লগ্নী বাড়বে, যা অনুন্নত দেশগুলিকে শিল্পোন্নত করে তুলবে এবং বিদেশের বাজারে নতুন সামগ্রী যেখানে সহায়তা করবে।

সমাজতন্ত্র ও নিরস্ত্রীকরণ

অপরপক্ষে উন্নত দেশগুলিতে নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা সমাজব্যবস্থার পার্থক্য অনুযায়ী ভিন্নরূপ নেবে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে যুদ্ধ-অর্থনীতি থেকে শান্তি-অর্থনীতিতে উত্তরণ শুধু পরিকল্পনার প্রশ্ন মাত্র। নিরস্ত্রীকরণের ফলে জাতির সম্পদের এক বড় অংশ হঠাৎ উদ্বৃত্ত হয়ে পড়বে। এই উদ্বৃত্ত যুদ্ধোপকরণ বা মানুষগুলিকে আবার অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে সময় নেবে কিছুটা, এবং এর ফলে সংঘর্ষজনিত কিছু বেকারসমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। পুনর্নিয়োগের জন্য সময় যত বেশি লাগবে, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাপ পড়বে তত বেশি। কিন্তু যেহেতু এই দেশগুলির অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পিত, কিছুদিনের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং পরিকল্পনা-নির্মাতাদের দক্ষতা এবং কুশলতার ওপর সাময়িক অস্বস্তির পরিমাণ নির্ভর করবে। রাষ্ট্রসংঘের নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত রিপোর্টেও তাই বলা হয়েছে, "In the socialist economics maintenance of effective demand while reducing military expenditure would be simply a matter

of the efficiency of the planning technique." উপরন্তু নিরস্ত্রীকরণের ফলে যে বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসম্ভার ও জনসম্পদ শান্তিপূর্ণ অর্থনীতির জন্য পাওয়া যাবে তার পুনর্নিয়োগ পুঁজিবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক জয়কে সুনিশ্চিত করে তুলবে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাই পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের কাজ সমাপ্ত করতে পারবে।

ধনতন্ত্র ও নিরস্ত্রীকরণ

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কিন্তু এই পুনর্বিন্যাসের কাজ খুব সহজ নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন যুদ্ধের ব্যয় সংকুচিত হয়ে আসে তখন (১৯২১-২২ সালে) একটি সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। ১৯২৯-৩৩ সালের ভয়াবহ মন্দাবাজারের অন্যতম কারণ ছিল এই পূর্ববর্তী পুনর্বিন্যাসের সংকট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অবশ্য পুনর্বিন্যাসের ফলে কোনো গভীর সংকট দেখা দেয়নি। তার কারণ, (ক) বিদেশে মার্কিন বাজার প্রসারিত হয়ে কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করে, (খ) জনসাধারণের বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতা (যা যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণের জন্য পুরোপুরি ব্যবহৃত হয় নি) ব্যবহৃত হয়, এবং সর্বোপরি (গ) সমরসজ্জা খুব বেশি হ্রাস পায়না। অর্থাৎ যুদ্ধকালীন চাহিদা কিছুটা হ্রাস পেলেও অন্যধরনের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে পুনর্বিন্যাসের কাজকে সহজ করে তোলে। কিন্তু সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের কার্যসূচী হঠাৎ কার্যকরী চাহিদা অনেকখানি সংকুচিত করে ফেলবে এবং সমানপরিমাণ কার্যকরী চাহিদা অন্য কোনোভাবে সৃষ্ট না হলে অনিবার্যভাবে বেকারসমস্যা ও মন্দাবাজারের সংকট দেখা দেবে।

কিভাবে এই সংকট গভীরতর হতে পারে, খুব সংক্ষেপে বিবৃত করা যায়। নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-উপকরণগুলির চাহিদা হ্রাস পাবে এবং নাগরিক বাহিনীর এক বড় অংশ বেকার হয়ে পড়বে। এর ফলে জনসাধারণের আয় এবং ক্রয়শক্তি কমবে এবং জিনিসপত্রের চাহিদাও কমবে স্বাভাবিক কারণেই। অপরপক্ষে জিনিসপত্রের উৎপাদন নির্ভর করে চাহিদার ওপর। চাহিদা কমলে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন হ্রাস করবে এবং কিছু লোক ছাঁটাই করবে। বর্ধিত বেকারসংখ্যা আবার জনসাধারণের সর্বমোট ক্রয়শক্তি হ্রাস করবে। যার ফলে উৎপাদন, কার্যকরী চাহিদা আবার হ্রাস পাবে ; বেকার আরও বাড়বে ইত্যাদি। এর ফলে একটি বিপজ্জনক চক্র সৃষ্টি হবে। যা ক্রমাগতই

উৎপাদন ও চাহিদা কমিয়ে আনবে এবং বেকারসমস্যা বৃদ্ধি করবে। সংকটের গভীরতা হবে অতলস্পর্শী, যেহেতু মার্কিন, যুক্তরাষ্ট্র বা পুঁজি দেশগুলির মোট সামরিক ব্যয়ের পরিমাণও বিপুল।

পরিকল্পনার অভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলির পক্ষে উদ্বৃত্ত সম্পদ ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। অবশ্য অর্থনীতির লগ্নির ধরন কিছুটা অদলবদল করে নিয়ে সমস্যার গভীরতা হয় কিছুটা কমিয়ে আনা যায়। যেসব যুদ্ধশিল্পগুলি রেফ্রিজারেটর, বৈদ্যু যন্ত্রপাতি বা মোটর সাইকেল তৈরি করে তাদের বিশেষ অসুবিধা হবে পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে। এমনকি "কোনো কোনো সামরিক শিল্পকে অল্প অদলবদল করে ভারি ট্রাক, ট্রাক্টর, মাটিকাটার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈরি হ পারে। এর জন্য কিছু অতিরিক্ত খরচ নিশ্চয়ই করতে হবে, কিন্তু পরিমাণ অস্বাভাবিক নয়।" অথবা সৈন্যসংখ্যা হ্রাসের কর্মসূচী ধাপে ধাপে কার্যকরী করলেও সমস্যাটা হঠাৎ খুব বড় হয়ে ওঠে না। সর্বোপরি কর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাহায্যে জাতীয় আয়ের পুনর্বণ্টন করে নিম্ন-আয় ব্যক্তিদের হাতে কিছু বেশি টাকা দেওয়া যেতে পারে। এদের সঞ্চয় যেহে কম, প্রায় পুরো টাকাটাই খরচ হয়ে কার্যকরী চাহিদা বাড়িয়ে দিতে পারে।

আন্তর্জাতিক চাহিদাবৃদ্ধির এই কয়টি পথ কিন্তু যথেষ্ট নয়। পুঁজিবা অর্থনীতির সীমারেখার মধ্যে এই সমস্ত পন্থায় এমন কার্যকরী চাহিদা সৃ হবে না যা নিরস্ত্রীকরণের ফলে হ্রাসপ্রাপ্ত কার্যকরী চাহিদার সমান। অতএ সংকট থেকেই যাবে এবং চক্রবৃদ্ধিহারে গভীরতর রূপ নেবে।

এই সিদ্ধান্ত সত্য এবং তথ্যানুগ এবং পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামো মধ্যেই এই সংকটের বীজ লুক্কায়িত রয়েছে। এমনকি নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধান করতে পারলেও এই সংকট দূর হবে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার না করেও এখনও কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধির কয়েকটি পথ খুঁজে বের করতে পারে যা নিরস্ত্রীকরণ জা সংকটের কালোছায়াকে অনেকখানি দূরে সরিয়ে দিতে পারবে। ১৯৬০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এক ভাষণে[১] প্রখ্যাত পোলিশ অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনে অসকার লাঙ্গে এমন কয়েকটি পথের সন্ধান দিয়েছেন, যার আলোচনা আমরা

১. *Polish Perspectives.* October, 1960. Oscar Lange: *Disarmament and the world economy.*

করব। ১৯৬২ সালের মার্চমাসে রাষ্ট্রসংঘ-মনোনীত একটি দশরাষ্ট্রবিশেষজ্ঞ কমিটিও এই সমাধানগুলির প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার

বিগত কয়েকটি দশকের স্নায়ুযুদ্ধ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের সম্ভাবনাকে। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মমুহূর্ত থেকে পুঁজিবাদী দেশগুলি নানাভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ এবং শত্রুতার মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চেয়েছিল। জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রায় কোনোরকম বৈদেশিক সাহায্য পায়নি। এর ফলে যদিও ভোগ্যদ্রব্যের প্রয়োজনের দিক থেকে সোভিয়েত জনসাধারণকে প্রথম ৩৬ বছর, বিশেষ করে ত্রিশ দশকের প্রায় পুরোটা, অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়নি। এমনকি খুব দ্রুতহার উন্নতির মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীর প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক অবরোধের উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

১৯১৭ সালে যে উদ্দেশ্য পুঁজিবাদ সাধন করতে পারেনি, আজ তার সাফল্য অলীক স্বপ্নবিলাসমাত্র। বর্তমান পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অঙ্গীভূত এবং অপর একতৃতীয়াংশ অন্তত শত্রু নয়। অতএব অর্থনৈতিক অবরোধের কোনো পরিকল্পনা আজ অবাস্তব। এ যেন পৃথিবীর অর্ধেক অপর অর্ধেকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছে। এর ফলে কার বেশি ক্ষতি হচ্ছে বলা মুশকিল।

অথচ এখনও পর্যন্ত পুঁজিবাদী দেশগুলি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ বেছে নেয়নি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীনতার কার্যসূচী মেনে চলছে। এর ফলে ভৌগোলিক, আবহাওয়াগত ইত্যাদি নানাদিক থেকে প্রয়োজনানুগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভাগবাঁটোয়ারা হতে পারছে না। দুটি শিবিরই প্রতিটি বিষয়ে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করছে, যদিও অনেক বিষয়ে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হলে ব্যয় সংক্ষেপ হতো এবং উভয়পক্ষই অর্থনৈতিকভাবে লাভ করত।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলির এই অযৌক্তিক মনোভাবের ফলে ইওরোপের বিভিন্ন দেশ প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করছে। এমনকি এশিয়ার

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের পথেও কৃত্রিম প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে এই মনোভাব। উদাহরণস্বরূপ চীন ও জাপানের সম্পর্কের কথা বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অথচ মার্কিন-প্রভাবে বর্তমানে জাপান এই সম্পর্ক বজায় রাখছে না। এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে দুই পক্ষেরই এবং বিশেষত জাপানের। কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও চীনের বাজার হস্তচ্যুত হবার ফলে যেমন, তেমনি এইসব অঞ্চল থেকে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের সরবরাহের অভাব, জাপানের শিল্পের সম্প্রসারণে বাধার সৃষ্টি করছে। এই অর্থনৈতিক পীড়নেরই প্রতিক্রিয়া জাপানের আইসেনহাওয়ার-বিরোধী আন্দোলন।

অথচ এই অর্থনৈতিক সম্পর্কহীনতার অপসারণ দুই শিবিরের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পক্ষে তো বটেই। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শিল্পায়নের হার প্রতি বৎসরে শতকরা দশভাগ, কোনো কোনো রাষ্ট্রে আরও বেশি। এই দ্রুত শিল্পায়নের কর্মসূচী বহু নতুন সামগ্রী প্রয়োজন সৃষ্টি করছে যা সরবরাহ করতে পারে পুঁজিবাদী দেশগুলি।

নিরস্ত্রীকরণের ফলে যে পরিমাণ কার্যকরী চাহিদা হ্রাস পাবে তা অনেকখানি পূরণ করা যাবে যদি পুঁজিবাদী দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদার সুযোগ গ্রহণ করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে এক বড়সংখ্যক এখনও অর্থনীতির বিচারে অনুন্নত। এদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন যন্ত্র, কাঁচামাল, শিল্প ও রসায়ন সামগ্রী, যা সরবরাহ করবার সুযোগ পেতে পারে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ। এমনকি যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োজিত শিল্প থেকে সরবরাহ করা যেতে পারে এসব। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চেকোস্লোভাকিয়ার মতো উন্নত দেশের জন্য প্রয়োজন স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য, যা পুঁজিবাদী দেশগুলি যুদ্ধশিল্প থেকেই সরবরাহ করতে পারে। অর্থাৎ, পুঁজিবাদী দেশগুলির উদ্বৃত্ত মূলধন লগ্নি করা যেতে পারে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপুল চাহিদা পূর্ণ করবার জন্য। এই সুযোগ সহজেই গ্রহণ করতে পারে এরা এবং অর্থনৈতিক সংকটের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে পারে।

অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নে সাহায্য

পুঁজিবাদী দেশগুলির সংকট সমাধানের আর একটি পথ অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নে সাহায্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিশেষ করে এই

সহযোগিতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু নতুন নতুন রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে জাতীয় প্রয়োজনে অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে চাইছে। অথচ অর্থনৈতিক বিচারে উন্নত দেশগুলির তুলনায় এরা পিছিয়ে রয়েছে অনেকখানি। স্বাভাবিক কারণেই তাই এদের অগ্রগতির হার খুব দ্রুত হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ উন্নত রাষ্ট্রগুলির নাগাল এরা কোনোদিনই পাবে না। অথচ যে বিরাট পরিমাণ মূলধন না পেলে দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব নয়, তার অভাব অনুভূত হচ্ছে প্রতিটি দেশে। বিশেষ করে বিদেশীমুদ্রার অভাব এদের অর্থনীতির প্রসার হতে দিচ্ছে না। অপরপক্ষে যে বিদেশী সাহায্য এরা পাচ্ছে, সেটুকুও নানাকারণে সমস্যার সমাধানে খুব বড় রকমের সাহায্য করছে না। প্রথমত, বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর। দ্বিতীয়ত, এই সাহায্যের এক বড় পরিমাণ বহু দেশে খরচ হচ্ছে সাহায্যকারী দেশগুলি থেকে সমরোপকরণ কিনবার প্রয়োজনে। তৃতীয়ত, এই সাহায্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঠাণ্ডাযুদ্ধের উদ্দেশ্য। জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার সঙ্গে সংগতি রেখে এই সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। ভারতের ক্ষেত্রে যেমন 'মিগ-বিমান-ক্রয়', কাশ্মির বা গোয়ার ব্যাপারে সরকারী মনোভাব সাহায্যকারী পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি বরদাস্ত করেনি এবং সাহায্যদানের প্রশ্ন ক্ষেত্রবিশেষে স্থগিত রেখেছে।

অথচ এই অনুন্নত দেশগুলির জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ যন্ত্রপাতি, বিশেষত ইঞ্জিন, মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান, ভারি যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি, যার যোগান সহজেই দিতে পারে উন্নত দেশগুলি। এবং এক্ষেত্রেও নিরস্ত্রীকরণের পরও পূর্বতন যুদ্ধশিল্পগুলির মারফতই যোগান দেওয়া যেতে পারে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী। অর্থাৎ নতুন এক বড় বাজারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে উন্নত দেশগুলি। প্রতিটি নতুন দেশেরই সহস্র সহস্র কোটি টাকার বিদেশী মূলধনের প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের রাষ্ট্রগুলি একযোগে মেটাতে পারে আন্তর্জাতিক কোনো সংগঠন, যেমন রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে কোনো সাহায্য বিতরণ করা হলে অনুন্নত দেশগুলিরও গ্রহণ করতে বিশেষ আপত্তি হবে না, যেহেতু জাতীয় সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবার কোনো সম্ভাবনা সে ক্ষেত্রে থাকবে না।

অবশ্য একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরবর্তী পর্যায়ে উন্নত দেশগুলির বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করবে কিনা।

এ আশঙ্কা অমূলক। ভবিষ্যতে অনুন্নত দেশগুলি এমন অনেক সামগ্রী
করতে সক্ষম হবে যা এখন উন্নত দেশগুলি সরবরাহ করে এবং নিঃসন্দেহে
সমস্ত সামগ্রীর ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির বাজার সংকুচিত হবে। কিন্তু
পক্ষে একটি উন্নতিকামী অথবা উন্নত অর্থনীতির প্রয়োজনে আরো
নতুন নতুন সামগ্রীর জন্য চাহিদার সৃষ্টি হবে এই দেশে। প্রকৃতপক্ষে
চাহিদার শেষ নেই এবং একটি ঐক্যবদ্ধ, যুদ্ধহীন পৃথিবীতে এই সমস্ত
উন্নত দেশগুলির তখনও অনেক কিছু ক্রয় করবার থাকবে বর্তমান
দেশগুলির কাছ থেকে। অবশ্যই পারস্পরিক সম্পর্ক তখন বর্তমানের
একপক্ষ কাঁচামাল অপরপক্ষ তৈরি মাল বিনিময়ের স্তরে থাকবে না।
উভয় পক্ষই কাঁচামাল এবং তৈরি মাল বিনিময় করবে অন্যপক্ষের কাঁচামাল
তৈরি মালের সঙ্গে। ভৌগোলিক ও আবহাওয়াগত সুবিধার জন্য জনসাধারণের
বিশেষ কুশলতার জন্য যে দেশ যে বস্তু সবচেয়ে সস্তায় সবচেয়ে বেশি
করতে পারবে, তারাই করবে। অর্থাৎ সর্ববিষয়ে স্বাবলম্বী হবার ঝোঁক
গিয়ে পারস্পরিক-নির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে। এই ঝোঁক আবার শান্তির
পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করবে অনেকখানি।

অর্থাৎ অনুন্নত দেশগুলির অপূর্ণ কার্যকরী চাহিদারও সুযোগ নিতে
উন্নত দেশগুলো।

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

কার্যকরী চাহিদাবৃদ্ধির আরেকটি পথ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। দুটি দিক দিয়ে এই পথ উন্মুক্ত: এক,
শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে; দুই, মহাকাশ অভিযানের বিভিন্ন
নিরীক্ষার ক্ষেত্রে। এই দুটি ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি বড় দেশ স্বীয়
এগিয়ে চলেছে অনেকখানি। কিন্তু দু-টি ক্ষেত্রেই আরো অনেক
আরো অনেক কিছু করা চলে যদি আরও অনেক অর্থ উভয়পক্ষ
পারে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় এই মুহূর্তে উভয় দেশেরই সাধ্য-বহির্ভূত
অথচ দুটি দেশের সম্মিলিত অর্থ খুব কম নয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ সহযোগিতার
মাধ্যমে আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ বা মহাকাশ অভিযানের
অনেকখানি যেতে পারে এরা। ভবিষ্যতে হয়তো আরো কয়েকটি
যোগ দেবে এদের সঙ্গে, এই কর্মপ্রচেষ্টায়। সব মিলিয়ে মানব

বিভিন্ন দেশের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বহু যোজন এগিয়ে যেতে পারে এবং মানব ইতিহাসের এক নতুন পর্বের সূচনা হতে পারে। এর ফলে প্রচুর অর্থ লগ্নি করবার একটি বড় ক্ষেত্রও পেয়ে যাবে পুঁজিবাদী দেশগুলি।

উপসংহার

উপসংহারে গোড়ার প্রশ্নটুকুরই জবাব দিতে চাই। প্রথমত, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ লুকিয়ে আছে, যা বারবার অর্থনৈতিক সংকটের পথে পুঁজিবাদকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, নিরস্ত্রীকরণের ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কার্যকরী চাহিদা হঠাৎ অনেকখানি হ্রাস পাবে, যা আভ্যন্তরীনভাবে অর্থনৈতিক কাঠামোর রদবদলের মাধ্যমে পূরণ করা পুরোপুরিভাবে সম্ভব হবে না। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধহীন পৃথিবীতে পুঁজিবাদী দেশগুলির শিল্প, বিশেষত পূর্বতন সমরশিল্পগুলির উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য কার্যকরী চাহিদার অভাব হবে না এবং পুঁজিবাদী দেশগুলি অর্থনৈতিক সংকটের সম্ভাবনা এড়িয়েই নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

অর্থাৎ নিরস্ত্রীকরণ শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক সর্ব ক্ষেত্রেই এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। অবশ্যই এই সমাধান স্বয়ংক্রিয়ভাবে হবে না, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলির সচেতন প্রচেষ্টা এবং জনমতের নৈতিক চাপই নিরস্ত্রীকরণের মহান উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারবে।

যুদ্ধবিরোধী চলচ্চিত্র

ধ্রুব গুপ্ত

"Mass Killing……does not the world encourage it !"……

ম'সিয়ে ভের্দু [চার্লস চ্যাপ

শিল্পীর সামাজিক এবং নৈতিক দায়িত্বসম্পর্কিত মীমাংসার অতীত বাগ্‌বি মুলতবী রেখে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে সমসাময়িক বিশ্বসমস্যা শিল্পীচিত্ত আলোড়িত করে এবং তার শিল্পকর্ম সে আলোড়নের সাক্ষ্যবহন ক অসূয়া প্রসূত কিংবা অজ্ঞতাজাত সকল রকম বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য চলচ্চিত্র শৈশবেই সস্তা আমোদের প্রকরণ সরবরাহের ব্যবসা ছাড়াও শিল্পাঙ্গের অধিকার অর্জন করেছে এবং এই ক্ষেত্রের শিল্পীরাও মূল্যবোধকে অন্বিষ্ট করেছে নিজ নিজ মানস অনুযায়ী। আর মূল্যবোধের চরম বিনাশের আশঙ্কা এই শিল্পীদেরও উদ্বেগাকুল করেছে, বেদনাকে উন্মথিত করেছে।

আজকের দিনের একজন বিদ্যার্থী বালকও জানে আণবিক অস্ত্রে যুদ্ধ সমগ্র মানবজাতির কি ভয়াবহ পরিণতির সম্ভাবনা নিহিত আছে। বা বর্ণগত বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পৃথিবী সর্বব্যাপী মারণযজ্ঞের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তার আংশিক হলেও প্রত্যক্ষ অ দু-দুবার অর্জন করেছে ইওরোপ এবং অন্তত একবার দক্ষিণপূর্ব এ প্রথম দুই মহাযুদ্ধই মানুষের মূল্যবোধকে সমূলে নাড়া দিয়েছে। শিল্পীর বিবেক ও ঔচিত্যবোধও অন্যান্য শিল্পাঙ্গের স্রষ্টাদের চিত্তবিক্ষো সঙ্গে প্রবলবেগে প্রকম্পিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী লোভ, জাতিগত সযত্নে আচ্ছাদিত করে যুদ্ধবাজেরা যুদ্ধে বীরত্বের গুণগান করেছেন— প্রতি কোনো চলচ্চিত্রশিল্পী নিক্ষেপ করেছেন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ, কেউ অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে মানুষের এই আত্মঘাতী প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করতে কারো অভিশাপ ধ্বনিত হয়েছে সুতীব্র ধিক্কারে, অহৈতুকী আত্মবি ট্র্যাজেডী চিত্রিত করেছেন কেউবা বেদনাবিধুর চিত্রভাষায়।

যে কজন মহৎ শিল্পীর প্রসাদে চলচ্চিত্র প্রথম নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলো—আমেরিকার ডি. ডব্লু. গ্রিফিথ্‌ তাঁদের অন্যতম। সুমহৎ কল্পনার রূপায়ণে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল মহাকাব্যোপম ছবি *Intolerance.* প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে গ্রিফিথ্‌ এ ছবিতে আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত মানুষের অসহিষ্ণুতার ধারাবাহিক দৃশ্যইতিহাস রচনা করেছেন—যে অসহিষ্ণুতা যে কোনো যুদ্ধের প্রধান ও প্রাথমিক ইন্ধন। চলচ্চিত্রশিল্পের অন্য এক প্রতিভা আইজেনস্টাইন মেক্সিকোর ইতিহাস অবলম্বনে যে অসামান্য চিত্রকাব্য রচনার স্বপ্ন দেখেছিলেন কুচক্রী ব্যবসায়ীর প্রতিকূলতায় সে স্বপ্ন সম্ভব না হলেও *Time in the Sun* নামে তার কিছু চিত্রাংশ রক্ষা পেয়েছে মিস্ মারী সিটনের প্রচেষ্টায়। ঐ ছবির মূল বিষয় অবশ্য জীবন-মৃত্যু, সৃষ্টি-প্রলয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক-আশ্রয়ী গভীরতর ও ব্যাপকতর দার্শনিক তত্ত্ব-অবলম্বী; কিন্তু মেক্সিকোর ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যলোভীর অত্যাচার বর্ণনায় এ ছবিতে ঐ মানবিক অসহিষ্ণুতারই নির্মম চিত্রণ লভ্য। সুনির্দিষ্টভাবে 'যুদ্ধবিরোধী' ছবি না হলেও এই পর্যায়ে ঐ সব মানবিক আবেদন-সম্পন্ন মহৎ শিল্পকৃতির প্রাথমিক প্রেরণার কথা অবশ্য স্মরণীয়। চলচ্চিত্রশিল্পের অপর এক প্রতিভা চার্লস চ্যাপলিনের 'মানবদরদী' আখ্যা প্রায় প্রবচনে পরিণত। নির্বাকযুগেই তাঁর শিল্পকৃতি একবার যুদ্ধের বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল তাঁর একান্ত স্বকীয় ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভাষায় *Shoulder Arms* ছবিতে।

সবাক যুগের সরাসরি যুদ্ধবিরোধী ছবি হিসাবে প্রথমেই স্মরণে আসে মাইলস্টোনের আমেরিকান ছবি *All quiet on the Western Front*-এর (১৯৩১) কথা। এ ছবির অবলম্বন অবশ্য রেমার্কের জনপ্রিয় উপন্যাস, জাতিগত স্বার্থরক্ষার নামে দেশের যুবশক্তি-অপচয়ের যে প্রচণ্ড অন্যায় ও ভয়াবহ ক্ষতি, তার বিরুদ্ধে এমন নালিশ চলচ্চিত্রের ভাষায় খুব কম জানানো হয়েছে। সুস্থ স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্কে যুদ্ধ যে বিচ্ছেদ টানে তাকে মাইলস্টোন ভাবালুতাবর্জিত গভীরতায় বেদনাবহ করেছেন। শেষদৃশ্যে close up-এ ব্যবহৃত চিত্রকল্পে যুদ্ধের ঐ জীবনবিধ্বংসী সৌন্দর্যগ্রাসী রূপ চিত্রিত হয়েছে সুন্দর সাংকেতিকতায়। রণক্লান্ত বন্ধুবিহীন তরুণ সৈনিক একা বসে আছে ট্রেঞ্চে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সামনে নিয়ে—একটা সুন্দর প্রজাপতি বসেছে ট্রেঞ্চের বাইরে—হাতের নাগালের মধ্যেই; প্রজাপতির

দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সৈনিক ; পর্দাজুড়ে দেখা গেল প্রজাপতি এ সৈনিকের ক্রমাগ্রসর হাতখানির close up···cut করে দেখানো হলো সৈনিকের হাস্য-দীপ্ত উৎসুক মুখ ; অকস্মাৎ এক শত্রুসৈন্যের গুলি বিঁধল তার মুখে, প্রজাপতি উড়ে গেল—পর্দাজুড়ে পড়ে রইল হতপ্রাণ সৈনিকের অবশ হাত। এর অনেক পরে—গতদশকে—জার্মানির সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় যুদ্ধের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া, যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল তাই নিয়ে রচিত রেমার্কের আরেক উপন্যাস 'তিনবন্ধু'ও চলচ্চিত্রায়িত করবার কাজ শুরু হয়েছিল আমেরিকাতেই, কিন্তু কোস্টারের ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতা হামফ্রে বোগার্টের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য অর্ধপথে সে ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

ত্রিশদশকে এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ নাৎসিবাদ পরিপুষ্ট হয় জার্মানিতে হিটলারের চেষ্টাযত্নে। আর্যরক্তের অভিমানে মত্ত হয়ে অনার্য রক্তপান করতে লোলুপজিহ্বা বাড়াল জার্মানি। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, ধনতন্ত্রের ভোজসভায় জার্মানির পাত পাড়তে দেরি হয়েছিল তাই সে গোঁ ধরল যার পাত পায় কেড়ে খেতে হবে। শক্তিমত্ত জার্মানিকে বিদ্রূপ করে চ্যাপলিন নির্মাণ করেছিলেন *Great Dictator*, আর ঐ উন্মত্ততার ফলে জগৎ জুড়ে ঘটল যে হত্যাকাণ্ড তাকে উচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনা করলেন 'নি ভেম্বু'-র শেষ বিচার দৃশ্যে।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংলণ্ড ও আমেরিকা ছিল প্রত্যক্ষ ধ্বংসের কেন্দ্র থেকে দূরে—লণ্ডন ও পার্লবন্দরে বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও একথা বলা চলে। হিটলারের হত্যাকাণ্ডের কুরুক্ষেত্র ছিল প্রধানত পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পূর্ব ইওরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ; হিটলারের প্রধান শত্রু ছিলেন ইওরোপবাসী অগণিত ইহুদি নরনারী তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবে এ ভূখণ্ডের বিনাশ ঘটেছে ভয়াবহভাবে, এ ভূখণ্ডের চলচ্চিত্রশিল্পে সেই বিনাশের প্রতিফলন তাই এমন সর্বব্যাপী, যুদ্ধের বিরুদ্ধে নালিশ তাই এত সুনিশ্চিত।

সাধারণত প্রতিরোধ আন্দোলনের চিত্রণের মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রে নাৎসিবর্বরতার বিরুদ্ধে ঐ নালিশ জানানো হয়েছে। সে কোনো কোনো শিল্পী অবশ্য আহত দেশাত্মবোধে প্রতিরোধকারীদের গৌরবগান করেছেন, তাদের বীরত্বের বন্দনাও গেয়েছেন—ফ্রান্সে রেনে ক্লেমের 'ব্যাটল অফ দি রেইল'-এর কথা স্মরণীয়, আবার কেউবা পোল্যাণ্ডের ওয়াইদা ক্রুদ্ধস্বরে বলেছেন এই অহেতুকী আত্মবিনাশে কোনো গৌরব নেই কো

পক্ষে। ফ্রান্সে নির্বাকযুগে শিল্পী জঁ রেনোয়ার 'গ্র্যাণ্ড ইলিউশন' ছবিতে যুদ্ধের অনৌচিত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে ঐ দেশের চলচ্চিত্রে নব্যপন্থী শিল্পীরা অবশ্য আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এবং ব্যক্তিসমস্যার ভিন্নতর প্রশ্নে নিমগ্ন এবং আলা রেনের 'হিরোশিমা মন আমুর' কিংবা আন্দ্রেই কায়াতের 'ক্রসিং অফ্ দি রাইন' ছবিতে যুদ্ধের তাণ্ডব পটভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত হলেও ঐ সব ছবির মূলসুর এতই অন্তর্ধর্মী যে ওদের 'যুদ্ধবিরোধী' ছবির শ্রেণীভুক্ত করবার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ইটালিতে যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তৈরি হয়েছিল রসেলিনির 'ওপেন সিটি' এবং 'পৈসান'। প্রতিরোধী আন্দোলনের ব্যর্থতার ট্র্যাজেডির নির্মম চিত্রণে এদের ছবিতে নরহত্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে। 'পৈসান' ছবির একটি চিত্রকল্প প্রাণনাশের এই ভয়াবহ মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির রূপায়ণ—নাৎসি সৈন্যের গুলিতে নিহত ইটালিয়ান প্রতিরোধকারীর দলের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে জলার ধারে কুঁড়ে ঘরের সামনে, ঐ মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক নিঃসঙ্গ শিশু, পটভূমিকায় ভোরের সূর্য। প্রতীকী রচনার ক্ষেত্রে এই দৃশ্যাংশ চলচ্চিত্র শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ইটালীয় চলচ্চিত্রে এযাবৎ হলিউডী আদর্শে গড়া 'সাদা টেলিফোন' যুগ (নায়িকার শয়নকক্ষে সাদা টেলিফোনের অবশ্যম্ভাবী অবস্থিতি থেকে এ নাম) চলছিল। যুদ্ধের ধাক্কায় সে প্রভাব কাটিয়ে কোনো কোনো চেতনাদীপ্ত শিল্পী চলচ্চিত্রে বাস্তবসমীক্ষার অবতারণা করলেন। ফলে লভ্য হলো নব্যচিত্ররীতি ও চিত্রদর্শন : 'নিও-রিয়ালিজম'। যুদ্ধোত্তর জীবনের সমস্যাই হলো ছবির উপজীব্য—ডি সিকার 'বাই সাইকল থিভস্'-এর কাহিনীর মৌলিক প্রশ্ন হলো বেকার সমস্যা—যুদ্ধোত্তর ইটালিকে যুদ্ধের দান। অতি সাম্প্রতিককালে ডি সিকা মোরাভিয়ার উপন্যাস অবলম্বনে 'লা চিওচিয়ারা' নামে যে ছবি নির্মাণ করেছেন সে ছবি তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন না হলেও যুদ্ধের বর্বরতা ও অভিশাপের বিরুদ্ধে সে ছবিতে তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে। যুদ্ধকালীন বর্বরতার ভয়াবহ ছবি পাওয়া যায় ইটালির তরুণ পরিচালক গিলো পন্টেকর্ভোর 'কাপো'তে। সাম্প্রতিককালের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিরোধী ছবিগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। নাৎসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদিদের উপর অমানবিক অত্যাচারের দৃশ্যবিবরণে এই ছবি ইটালীয় বাস্তবতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ইহুদিদের প্রতি নাৎসি-অত্যাচার, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের দুঃস্বপ্নসম

নরকত্ব পূর্ব ইওরোপীয় দেশগুলির যুদ্ধবিরোধী ছবিগুলির প্রধান উপজী… পূর্ব জার্মানির পরিচালক মেট্‌জিগের 'ম্যারেজ্ আণ্ডার দি শ্যাডোজ' … প্রতি নাৎসি অত্যাচারের পটভূমিকায় রচিত মর্মস্পর্শী ট্র্যাজেডি। … ছবিটির নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কন্‌রাড্ উল্‌ফের 'স্টারস্' এবং '… ম্যাম্‌লক্' এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'স্টারস্' ছবিতে … জার্মান সৈনিক এক ইহুদি রমণীকে ভালোবাসে যুদ্ধকালীন সমস্ত … বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে। আসলে সে ছিল শিল্পী; রূপময় পৃথিবীকে … সীমায় ধরার সাধনা ছিল তার, যুদ্ধের অমানবিক বীভৎসতার মধ্যে … ছোট টিলার ওপরে বসে প্রাকৃতিক শোভার ছবি আঁকে। যুদ্ধবাজের অনমনীয় অনুশাসনে শিল্পীকে তুলি ছেড়ে বন্দুক ধরতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু … চেষ্টাতেও সে তার প্রণয়পাত্রীকে কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের যন্ত্রণা ভোগ … উদ্ধার করতে পারল না—মালগাড়িতে পিণ্ডাকৃতি মনুষ্যস্তূপের মধ্যে … চলল কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের দিকে—অক্ষম বেদনায় তাড়িত হয়ে … মালগাড়ির পিছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল কিছুদূর পর্যন্ত। কাহিনীর … সাদৃশ্য দেখা যায় চেকোস্লোভাকিয়ার জিরি ওয়াইসের ছবি 'রোমিও, জুলিয়েট এণ্ড ডার্কনেস' এবং ইউগোস্লোভিয়ার স্টিগলিকের 'নাইস্থ সার্কল' ছবির … ঐ দুই ছবিতেও দেখানো হয়েছে ইহুদি মেয়ের প্রতি এক চেক এবং … ইউগোস্লাভ যুবকের প্রেমের ভয়ংকর পরিণতি। ভাবালুতা বর্জনে এবং … শূন্যতা রচনায় 'নাইস্থ সার্কল' অবশ্য গুণগত বিচারে চেক ছবিটির চেয়ে উচ্চ… আসনের অধিকারী। জন্তুসদৃশ ক্যাক্‌টাসের পাশে একসারি ইহুদি … মাটি কাটার দৃশ্যটি অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়, কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের চিত্রণে দান্তে-… নারকী বর্ণনার আভাস (ছবির নামকরণেও দান্তের প্রভাব লক্ষণীয়) … আর সবশেষে কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে পালাবার শেষ চেষ্টা … হবার পর কাঁটাতারের বেড়ার গায়ে বিদ্যুতাঘাতে নায়কনায়িকার … পর কয়েক সেকেণ্ড সাদা পর্দায় ভয়াবহ সর্বগ্রাসী শূন্যতা … হয়েছে।

অবিভক্ত জার্মানির অসামান্য চলচ্চিত্রকলার (যুদ্ধবিরোধী ছবি … পাব্‌স্টের 'ওয়েস্টফ্রন্ট ১৯১৮' স্মরণীয়) ঐতিহ্যের গুণগত ফলশ্রুতি ঘটল … পূর্ব জার্মানির ছবিতেই। পশ্চিম জার্মানি বহুকাল পর্যন্ত চিনিমাখা … আর দু-একটি 'মন্দ নয়' গোছের কমেডি রচনা করেই চলচ্চিত্রে কার্য…

রেখেছিল। ইহুদিবিদ্বেষের অযৌক্তিকতা নিয়ে ৎজোয়াইগের গল্প অবলম্বনে রচিত 'রয়াল গেম' যুদ্ধবিরোধী ছবির তালিকাভুক্ত হতে পারে হয়তো, কিন্তু ঐ অপরিণত রচনা কোনোমতেই চলচ্চিত্রশিল্পের গৌরববৃদ্ধি করেনি। প্রায় অকস্মাতই সে দেশ থেকে তৈরি হলো অভিনেতা বার্নাড ভিকির যুদ্ধ-বিরোধী মানবিক আবেদনসম্পন্ন ছবি 'দি ব্রীজ'। জাতীয় কর্তব্যের নামে যুদ্ধদানবের পায়ে যৌবনকে বলিদানের নৃশংস চিত্রণের মাধ্যমে বার্নাড ভিকি তীব্র বেদনার সঙ্গে নালিশ জানিয়েছেন জীবনের এই অন্যায় অপচয়ের বিরুদ্ধে। ইংরেজ শিল্পী ডেভিড লীনের ব্যয়বহুল সুদীর্ঘ রঙীন ছবি 'ব্রীজ অন রিভার কোয়াই'-কে ইংরেজ সমালোচকরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অল কোয়ায়েট আখ্যা দেবার জন্য তৎপর হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সম্মান বার্নাড ভিকির এই ছবিরই প্রাপ্য।

নরমেধযজ্ঞে জীবনযৌবনের ঐ বিনাশের দরুণ পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্রশিল্পী ওয়াইদার বিক্ষোভ আরো তীব্র, তিরস্কার আরো তীক্ষ্ণ, তাঁর বেদনা আরো সুগভীর। জীবনের সুস্থ আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলির অচরিতার্থতাজনিত ক্ষতির জন্য 'কানাল' ও 'এ্যাশেজ এণ্ড ডায়মণ্ডস্'-এ তাঁর গভীর শোক, তাঁর চিত্তদাহ সমগ্র মানবের সপক্ষে, মানুষের অমানবিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ। তাঁর কান্নায় ব্যর্থ যৌবনের যন্ত্রণার বেদনার অনবরুদ্ধ প্রকাশ। ঐ দুটি ছবিতে ব্যবহৃত চিত্রকল্পে প্রায় সর্বত্রই সেই বেদনাকে দৃশ্যময় করা হয়েছে। বোমাবিধ্বস্ত বাড়িতে ভাঙা বেসুরো পিয়ানো, জনশূন্য আবর্জনাময় রাস্তায় একটি চেয়ার, আণ্ডারড্রেনের অন্ধকারে ভাসমান মৃতদেহ, নৈঃশব্দ্যকে ভয়াবহ করে তুলে বিকৃতমস্তিষ্কের বাঁশির করুণ সুর, বাঁচার তাগিদে প্রাণান্তকর ব্যর্থ সংগ্রামের শেষে "বেদনার পাশে শুয়ে গান"; অথবা কণ্টককিরীট যিশুখ্রীষ্টের উল্টে পড়া মূর্তি, হাওয়াতে উড়ে যাওয়া ছেঁড়া কাগজের টুকরো, কিংবা আবর্জনা স্তূপে যুবকের বীভৎস মৃত্যু—সমস্ত চিত্রকল্পই মানুষের আত্মবিনাশের বেদনায় অধীর, প্রতিকারহীন অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর। প্রতিরোধ আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিতে গৌরবান্বিত করবার কোনো উদ্দেশ্য ওয়াইদার নেই, অকালমৃত্যুর অস্বাভাবিকতাজনিত ট্র্যাজেডিকে চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে চিত্রায়িত করাই তাঁর অন্বিষ্ট। প্রথামাফিক 'প্যাসিফিস্ট ছবি' না হলেও সুগভীর মানবপ্রেমের খাতিরেই ঐ দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি 'যুদ্ধবিরোধী চলচ্চিত্র' পর্যায়ে অবশ্য স্মরণীয়।…পোলাণ্ডের অপর শক্তিমান শিল্পী আন্দ্রেই মুঙ্ক

ব্যঙ্গকৌতুক রচনায় সিদ্ধহস্ত—যুদ্ধবাজদের অসার বীরত্ববোধকে তিনি
করেছেন তাঁর ছবি 'ইরয়িকা'-তে।

পোলিশ ছবির তীব্রতা বা irony কিছুই লভ্য নয় সাম্প্রতিক
ছবিতে এবং চুকরাই তাঁর কবিত্ব নিয়ে যুদ্ধ অবলম্বনে 'ব্যালাড' রচনায়
তৃপ্ত। সৈনিকের স্ত্রীর বারবণিতায় পরিণতি দেখিয়ে চুকরাই যুদ্ধের
আভাস দেন অবশ্য, বিকলাঙ্গ সৈনিকের দুশ্চিন্তাকেও কিছুটা আমল
তিনি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছবিতে মধুর ও করুণ রসের প্রাধান্য 'যুদ্ধ বিরোধী
অনেকটাই মোলায়েম করেছে, যদিও প্রথম দৃশ্যে তরুণ সৈনিকের প্রতি
করে আসা ট্যাংকের কৌশলপূর্ণ শট্‌টি কিছুটা প্রতীকী অর্থবহ।
কালাটোসভের 'ক্রেন্‌স্ আর ফ্লাইং'-এ ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি রচনাতে
অমঙ্গল কিছুটা প্রতিষ্ঠিত। বান্দারচুকের 'ম্যান্‌স্ ডেষ্টিনি' যুদ্ধ বিরোধী
প্রকট করেছে বটে, কিন্তু দু-একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্যাংশ ছাড়া এ ছবি
অপরিচ্ছন্ন, কাঁচা হাতের রচনা।

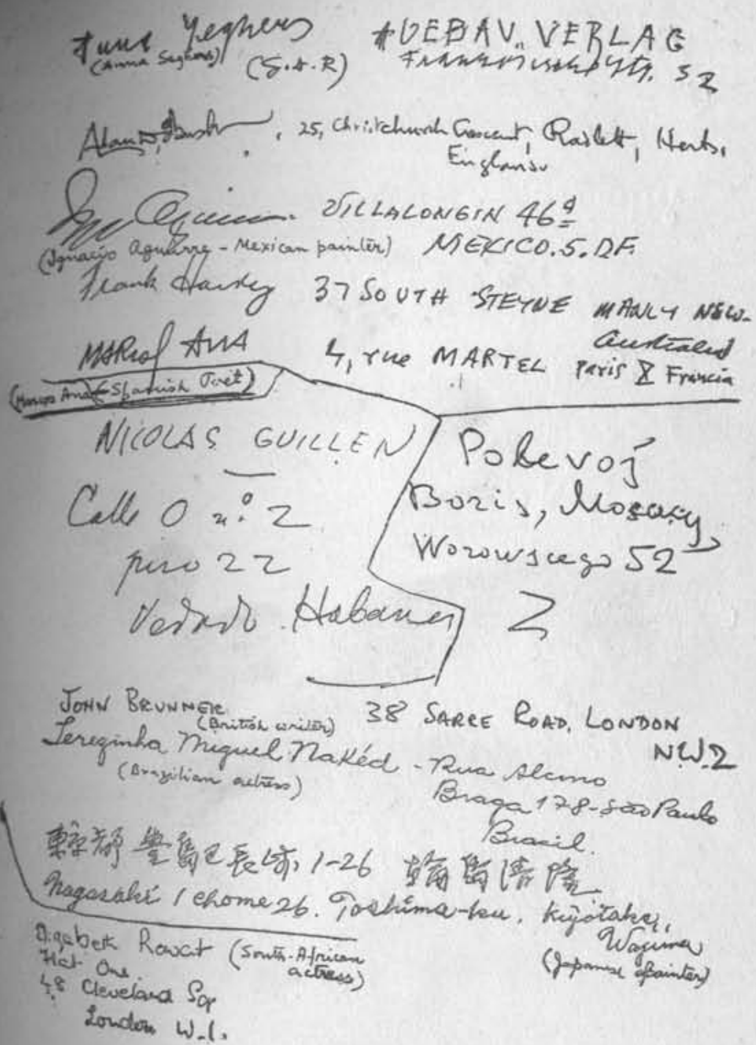
আণবিক বোমাবিধ্বস্ত জাপানি নরনারী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেই সম্ভাব্য তৃতীয়
স্বরূপকে চিনতে পেরেছে কিছু পরিমাণে। শুধু তাৎক্ষণিক প্রাণহানিই না
বিজাতীয় ব্যাধিতে ভবিষ্যৎ মানবেরও দেহমন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।
বিভীষিকার বিরুদ্ধে হাহাকার তাই জাপানি ছবিতে এত মর্মান্তিক—'হিরোশিমা'
ছবিটি সে হাহাকারের প্রামাণ্য চিত্র এবং কেনেতো সিন্দোর 'চিলড্রেন
অফ হিরোশিমা'ও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পারমাণবিক মারণাস্ত্র প্রস্তুতকারী
যুদ্ধমতলবী যদি ঐ ছবি দেখে, এবং তার মধ্যে যদি মনুষ্যত্বের কণামাত্র
অবশিষ্ট থাকে, তবে সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কথা ভুলে
নিছক ভয়ের বশেই অস্ত্রপরীক্ষা ত্যাগ করবে।

হলিউডের বাণিজ্যপণ্য নির্মাণের কারখানাঘরেও মাঝে মাঝে কোনো
কোনো সংবেদনশীল চিত্র নির্মাতা যুদ্ধ তাণ্ডবে জীবনের বিনাশে আন্তরিক
দুঃখপ্রকাশ করেছেন। মাইলস্টোনের 'এ ওয়াক ইন দি সান',
ওয়াইল্ডারের 'স্টালাগ সেভেন্‌টিন্', ফ্রেড জিনেমার্নের 'ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি'
নিকোলাস রে-র 'বিটার ভিকট্রি' এ প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। 'বিটার ভিকট্রি'
ছবিটিতে মানসিক স্বাস্থ্যে যুদ্ধের ভয়াবহ প্রভাব দৃশ্যময় করা হয়েছে। আমেরিকা
সার্থক যুদ্ধবিরোধী ছবি স্ট্যানলি কুব্‌রিকের 'পাথ্‌স্ অফ গ্লোরি'র
করণেই যুদ্ধ নেতাদের প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা করবার অমানবিক প্রবৃত্তি

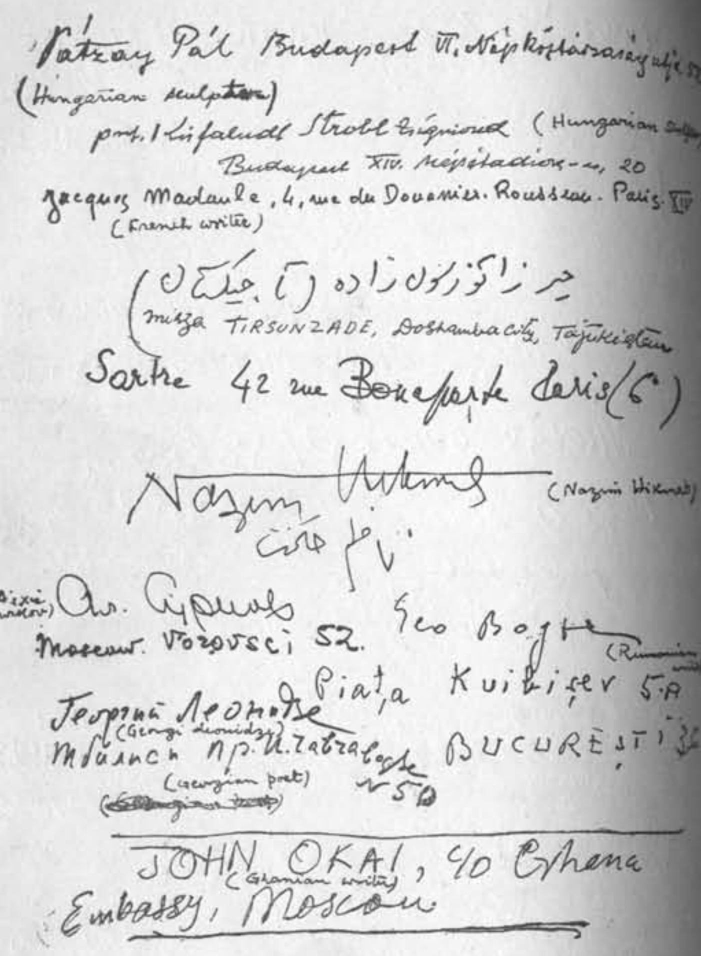
প্রতি বিদ্রূপটি স্পষ্ট হয়েছে। 'War heroics'-কে মূলধন করে 'টু হেল এণ্ড ব্যাক' বা 'ব্যাট্‌ল্ হিম্' জাতীয় পয়সা পিট্‌বার মতলবে তৈরি অগুনতি ছবির মধ্য থেকে ঐ সব ছবিকে আমাদের বেছে নিতে হয় সতর্ক দৃষ্টিতে। ইংলণ্ডের চিত্র নির্মাতারাও যুদ্ধের অব্যবহিত পরে 'the good sides of war' দেখানোর সুমহৎ দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছিলেন। তার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল 'ড্যাম বাস্টার্স', 'রিচ্ ফর দি স্কাই' বা 'ব্যাটল অফ্ দি রিভার প্লেট' জাতীয় যুদ্ধের গুণগান সম্বলিত ছবি! ডেভিড লীনের সাম্প্রতিক ছবি 'ব্রীজ অন্ রিভার কোয়াই'কে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ 'যুদ্ধ বিরোধী' ছবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন কোনো কোনো সমালোচক। কিন্তু ঐ ছবিতেও ইংরেজ সৈন্যের বীরত্বের গুণগানে ছবিটিতে প্রায় Chauvinistic সুর লেগেছে। হলিউডী আদর্শে নির্মিত এই বিপুলাকৃতি ছবিতে যুদ্ধের বিভীষিকার চেয়ে তার romantic grandeur-ই ফুটেছে ভালো। বরঞ্চ লেস্‌লি নরম্যানের সাম্প্রতিক ছবি 'দি লং এণ্ড দি শর্ট এণ্ড দি টল'-এ এক জাপানি ও এক ইংরেজ সৈন্যের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার মানবিকতা যথেষ্ট পরিমাণে আন্তরিক এবং এ ছবির অন্তিম tragic irony অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত। লীনের ছবির spectacular কর্মকাণ্ডের পর ডাক্তারবাবু বিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর মতো যখন রায় দেন "যুদ্ধটাই পাগলামি" তখন তাকে ফাঁকা আওয়াজ মনে হয় অথচ প্রাণভয়ে ভীত নির্বাক জাপানি সৈনিকের শঙ্কিত মুখের 'ক্লোজ আপ'-এই যুদ্ধের ভয়াবহতা চলচ্চিত্রের দৃশ্যধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে নরম্যানের ছবিতে।

মনোবিজ্ঞানীর মতে যুদ্ধ হলো collective psychosis-এর চূড়ান্ত উৎকট প্রকাশ। কারো মতে সে মনোবিকারের উৎস হলো বিশেষ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি; তা যদি হয় তবে চিকিৎসার পথ সহজ না হলেও সুনির্দিষ্ট। আবার কারো মতে সে মনোবিকারের প্রকৃতি Congenital, মানুষের স্বভাবসঞ্জাত, আদি এবং অকৃত্রিম; চিকিৎসার উপায়ও তবে অনিশ্চিত। কারণ যাই হোক, কার্যটি আমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষে ভয়াবহ, সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত আমাদের সেই ভয়কে, যন্ত্রণাকে, অনীহাকে চলচ্চিত্রশিল্পীরা দেশে দেশে নিজস্ব শিল্পকর্মে দৃশ্যমান করেছেন। সম্ভাব্য তৃতীয় মহাযুদ্ধের আসল স্বরূপ হয়তো এখন আমাদের কল্পনাতীত, কিন্তু আশঙ্কার সর্বব্যাপী ছায়া সমগ্র বিশ্ববাসীর চৈতন্যকে আচ্ছাদিত করেছে। আজকের ঠাণ্ডাযুদ্ধের শঙ্কাকুল জগতে রাবীন্দ্রিক

বিশ্ববোধের প্রেরণায় চলচ্চিত্রশিল্পীরা তাঁদের শিল্পমাধ্যমে বিশ্বমৈত্রী আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারেন—কিন্তু শিল্পীর নিজস্ব তাগিদ না থাকলে এ উপদেশ বাইরে থেকে দেবার কোনো তাৎপর্যই নেই। অপরদিকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাও কতদূর আন্তরিক এবং ফলপ্রসূ হবে জানা নেই। ইতিমধ্যে তবে কি হবে? ঐ সর্বব্যাপী আশঙ্কার তাড়নায় ফেলিনির 'দলচে ভিতা'র স্টাইনারের মতো কেউ হয়তো শিশু সন্তানসহ আত্মঘাতী হবে, কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র পক্ষীপ্রেমিকের মতো পারমাণবিক বিষাক্ত বাষ্পে নিহত পথভ্রান্ত পাখির ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক ভবিষ্যতের কথা কে রাত্রিকে বিনিদ্র করবে!



'পরিচয়'-এর প্রতি
নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের শুভেচ্ছা



'পরিচয়'-এর প্রতি
নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের শুভেচ্ছা

আবার 'বিশ্বমনীষী-সঙ্গমে'

চিন্মোহন সেহানবীশ

'পরিচয়'-এর এক শারদীয় সংখ্যার পাতায় যে কাহিনী একদিন শুরু করা গিয়েছিল আবার তারই জের টানতে বসেছি ঠিক সাত বছর পরে। বিশ্বশান্তি সম্মেলনে সমবেত নানা দেশের মনীষীদের সঙ্গে ক্ষণিক সাক্ষাৎ সেবার ঘটেছিল হেলসিঙ্কিতে, এবারে মস্কোয়। অসাধারণদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই—তাই হেলসিঙ্কির মতো এবারও ভরসা করে লিখতে বসেছি মস্কোর কাহিনী।

কিন্তু হালের বৃত্তান্ত শুরু করার আগে এই সাত বছরে পৃষ্ঠপটের যে অবস্থান্তর ঘটেছে তার দিকে একটু নজর ফেরানো দরকার। আসলে বিশ্ব-শান্তি সম্মেলন এ কাহিনীর নিষ্ক্রিয় পৃষ্ঠপটমাত্র নয়, তার সজীবতার পক্ষে আলো-জল-মাটিরই সামিল। তাই গোড়াতেই সাত বছর আগে-পরের ব্যবধান কতটা তার হিসেব নেওয়া যেতে পারে কিছুটা।

১৯৫৫ সনে হেলসিঙ্কির শান্তিতীর্থে জড়ো হয়েছিলেন পৃথিবীর ৬৮টি দেশের ১৬৪০ জন প্রতিনিধি, ৯২ জন অতিথি ও ১০৯ জন দর্শক। এবার মস্কোয় এসেছেন ১২১টি দেশ থেকে ১৯০৬ জন প্রতিনিধি, ২৩৯ জন অতিথি ও ৩৩১ জন দর্শক। এর মধ্যে মহাদেশ হিসাবে সব চাইতে বেশি দেশের (৩৮) প্রতিনিধি এসেছেন আফ্রিকা থেকে, যার মধ্যে অনেকগুলির স্বাধীন সত্তাই ছিল না সাত বছর আগে। এমনকি যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রাম এখনও সার্থকতার চূড়ায় শিখরে পৌঁছয় নি—সেই এঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের রণক্ষেত্র থেকেও এসেছেন স্বাধীনতার নির্ভীক সৈনিকের দল আর ন-বছর ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর সগু অস্ত্র তূণে ভরে শান্তিযজ্ঞেও যোগ দিতে এসেছেন আলজিরিয়ার দেশপ্রেমিকেরা। এশিয়ার ২৫টি দেশ প্রতিনিধি পাঠিয়েছে, তার মধ্যে ভারতবর্ষ ও জাপানের প্রতিনিধি সংখ্যা শতাধিক। ল্যাটিন আমেরিকার ২৫টি দেশ থেকেও এবার এসেছে বড় বড় দল, তার মধ্যে ব্রেজিল তো পাঠিয়েছে সম্মেলনের তৃতীয় বৃহত্তম দল—১৭৪ জনের। আর সারা

ছুনিয়ার দৃষ্টি যে দেশের পরে সেই ছোট্ট কিউবা থেকেও এসেছেন ৪১ জন। দেশের শান্তি-শত্রুর চক্রান্তে বারবার বিড়ম্বিত হতে থাকলেও বিশ্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরাও বদ্ধপরিকর।

অন্যদিকে সম্মেলনের বৃহত্তম প্রতিনিধি দল (১৯০ জনের) খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে—হেলসিঙ্কিতে যেখানে কোনোমতে পৌঁছেছিলেন ৪ জন মাত্র। এই ঘটনার গুরুত্ব যে কতখানি তা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি—ইওরোপের এই প্রধান দেশগুলির প্রত্যেকটি থেকেও এবার এসেছেন শতাধিক প্রতিনিধি। স্পেন, পর্তুগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, গোয়াটেমালা, পানামা, ফিলিপাইনসের মতো দেশ থেকে স্বৈরাচারী শাসনের বেড়াজাল পেরিয়ে সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন বেশ কিছু নির্ভীক মানুষ। সম্মেলনের মঞ্চে এসে মিলেছেন পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিনিধি দল।

এতো হলো সংখ্যার হিসেব। অন্য বিচারেও বিপুল প্রসারের সাক্ষ্য মেলে ভুরিভুরি। যেমন সম্মেলনের উদ্যোগপর্বে ও তার অধিবেশনে মতবৈচিত্র্যের সমাবেশ। এমন সব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এবারে সম্মেলন আহ্বানে বিশ্বশান্তি সংসদের সঙ্গে একযোগে উদ্যোগী হয়েছিলেন যাঁরা এতাবৎ ঐ সংসদের থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে এসেছেন। আর প্রতিনিধি বা দর্শক পাঠিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করে সম্মেলনের কাজে যোগ দিয়েছেন ঐ রকম অসংখ্য ব্যক্তি বা সংগঠন।[১] এঁদের মধ্যে অনেকেরই গোড়ায় গোড়ায় সংশয় ছিল সম্মেলনের

১। যেমন ব্রিটেন থেকে এসেছেন লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেল-পরিচালিত 'কমিটি অফ হাণ্ড্রেড'... পাদ্রী কলিনস পরিচালিত 'ক্যাম্পেন ফর নিউক্লিয়ার ডিসারমামেন্ট'-এর দল, আমেরিকা থেকে 'উইমেন স্ট্রাইক ফর পিস', এমনকি কিছুটা মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তরঘেঁষা 'ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এ সেন নিউক্লিয়ার পলিসি'-র প্রতিনিধিবৃন্দ। 'ক্রিশ্চান পিস কনফারেন্স', বেদান্ত মুভমেন্ট' (ব্রিটেন), 'ন্যাশনাল কোয়েকার অর্গানাইজেশন', মেথডিস্ট চার্চ (আমেরিকা)-এর মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, 'ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস কমিটি', 'ইন্টারন্যাশানাল মুভমেন্ট ফর এ ফেডরাল ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট', 'ইন্টারন্যাশনাল রেডিও এণ্ড টেলিভিশন অর্গানাইজেশন', 'দি ইউনিভার্সাল এসপ্যারান্টো এসোসিয়েশন' -এর মতো বিচিত্র প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস', 'উইমেন্স ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশন', 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ,' 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস, ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ ডেমোক্র্যাটিক ল ইয়ার্স,' 'ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফজার্নালিস্টস', 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ সাইন্টিফিক ওয়ার্কার্স'-এর মতো শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং 'দি ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড উইদাউট দি বম্ব কনফারেন্স' (আক্রায়

আন্দোলনের সার্থকতা সম্পর্কে। তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল অবাধ আলোচনার ও স্বাধীন মতপ্রকাশের। সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে এঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে উদ্যোক্তাদের প্রতিশ্রুতি পালিত হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে এবং যে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেছে তা ঐ যুক্ত আলোচনারই ফল এবং প্রায় সর্ববাদী-সম্মত (সিদ্ধান্তের পক্ষে ছিলেন ২১৮৬ জন, বিপক্ষে ২ জন এবং ভোটদানে বিরত ছিলেন ৭ জন)। সম্মেলনের সার্থকতার এই একটা বড় দিক। দ্বিতীয়ত, আলোচনার সুস্থ আবহাওয়ার দরুণ বিরোধী বক্তব্য সকলেই ধৈর্য ধরে শুনেছেন ও অনেক বদ্ধমূল ধারণা পাল্টেছেন। আর তার ফলে সমৃদ্ধতর হয়েছে তাঁদের ঐক্যচেতনা। এর শুভ ফল নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যাবে আগামী দিনে।

আর এক দিক থেকেও এ সম্মেলনের গুরুত্ব অসামান্য। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বরাবর প্রায় সরকারীভাবেই পোষকতা করে এসেছেন শান্তি আন্দোলনের। এবারকার মস্কো অধিবেশন তো তার চরম নিদর্শন। প্রায় ২৫০০ প্রতিনিধি, দর্শক ও প্রতিনিধির (আর সেই সঙ্গে ৩২২ জন দপ্তরের কর্মী) সবরকম তত্ত্বাবধানের নিখুঁত ব্যবস্থা যেভাবে সম্পন্ন হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে সোভিয়েত শান্তি সংসদ, সোভিয়েতের সাধারণ মানুষ ও সরকার একযোগে এ কাজে হাত না দিলে এমনটি সম্ভব ছিল না। এমন কি সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্ণধার নিকিতা ক্রুশ্চভ স্বয়ং এসেছেন শান্তি সম্মেলনের অধিবেশনে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে তাঁর সরকারের মতামত জানাতে।

তবু এবারে কিন্তু আর শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়—এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলি থেকে যে সব প্রতিনিধি দল এসেছে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার অনেকগুলির পিছনেই আছে দেশের সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন। বহু দেশের প্রতিনিধিমণ্ডলীতে দু-একজন মন্ত্রী বা রাজপুরুষ এসেছেন—কোথাও বা এসেছেন শাসক দলের এক বা একাধিক নেতা। বিভিন্ন দেশ থেকে পার্লিয়ামেন্টের সদস্য এসেছেন ২২০ জন—এত বেশি সংখ্যক পার্লিয়ামেন্ট সদস্য আর কোনো শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত থাকেননি এতাবৎ। এর মধ্যে সোস্যালিস্ট, ক্যাথলিক, লিবারাল, জাতীয়তাবাদী, কমিউনিস্ট—সব দলেরই লোক অবশ্য আছেন। অর্থাৎ একদিকে যেমন বিপুল বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে তেমনই

অধিষ্ঠিত), 'কনফারেন্স অফ আফ্রিকান পিপলস,' 'আফ্রো এশিয়ান পিপলস সলিডারিটি কাউন্সিল' (কায়রোয় অধিষ্ঠিত), 'ইণ্ডিয়ান পার্লিয়ামেন্টেরিয়ান ফর পিস,' 'সুইশ মুভমেন্ট এগেনস্ট নিউক্লিয়ার আর্মস', জাপানের 'ন্যাশনাল কাউন্সিল এগেনস্ট এ এণ্ড -এইচ বম্বস' প্রভৃতির মতো মহাদেশীয় বা জাতীয় সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা তো ছিলেনই।

অন্যদিকে বলা চলে যে সমাজতান্ত্রিক এবং এশিয়া আফ্রিকার সদ্যমুক্ত দেশ... সরকারী, অন্তত আধা-সরকারী সমর্থনে পুষ্ট হয়ে এবারকার মস্কো ... সমগ্র 'শান্তি অঞ্চল'-এর (peace zone) প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে ... বহুলাংশে। এইখানেই রয়েছে এবারকার শান্তি মহাসম্মেলনের বিপুল সার্থ...

ভারতীয় প্রতিনিধি দল সম্পর্কে এবার দু-চারটি কথা বলে মূল প্রসঙ্গে ... যাব। গতবারের মতো এবারেও দলের নেত্রী ছিলেন শ্রীমতী রামেশ্বরী নে... অসুস্থতার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই বর্ষিয়সী নেত্রী যেভাবে শান্তি আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তা সত্যই আশ্চর্য। তাঁর সহজ মর্যাদা... নেতৃত্ব ভারতবর্ষের আসনকে আরো সুপ্রতিষ্ঠ করতে সাহায্য করেছে ... শান্তির দরবারে। তিনি ছাড়া দেওয়ান চমনলাল, ডাঃ তারাচাঁদ, ডাঃ ... সাপ্রু, ডাঃ অনুপ সিং ও শ্রীমতী সুভদ্রা যোশীর মতো প্রখ্যাত কংগ্রেস... পার্লিয়ামেণ্ট সদস্যেরাও ছিলেন প্রতিনিধি দলে (পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের আইন... কংগ্রেসী সভাপতিরাও ছিলেন এঁদের সঙ্গে)। অন্যদিকে শ্রীভূপেশ গু... শ্রীগোবিন্দন নায়ারের মতো সুপরিচিত পার্লিয়ামেণ্ট সদস্য, পশ্চিম বাংলার ... সভার বিরোধী পক্ষের খ্যাতনামা নেতা শ্রীজ্যোতি বসু, নিখিল ভারত ... ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ও বোম্বাই-এর প্রাক্তন মেয়র শ্রীমিরাজকর ... পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার দুই সদস্য শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযামিনী... ছিলেন বিরোধী পক্ষ থেকে। এ দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের দুই বর্ষীয়ান না... 'গদর' দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক বাবা করম সিং চিমা ও বাবা ... কানাডিয়ানও ছিলেন আমাদের দলে। এঁদের বয়স যথাক্রমে ৯৫ ও ৮... হওয়া সত্ত্বেও এঁদের আগ্রহ অনেক তরুণকেও লজ্জা দিতে পারে। 'গা... ফাউণ্ডেশন'-এর সহ-সম্পাদক শ্রীওম প্রকাশ গুপ্ত ও কিছু সর্বোদয়পন্থী ... প্রতিনিধি দলে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক কৌশাম্বী ও ... সিং শোখে মহাশয়। সংবাদপত্রজগত থেকে ছিলেন বিশ্বশান্তি ... অন্যতম নেতা শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও 'ব্লিৎস' সম্পাদক শ্রীকারাঞ্জিয়া... সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছিলেন শ্রীকাকা সাহেব কালেলকার, শ্রীনীলমনি ফুকন, ... মুলকরাজ আনন্দ, শ্রীবিষ্ণু প্রভাকর, 'পরিচয়' সম্পাদক শ্রীগোপাল হা... শ্রীজীবনন্দন, শ্রীসাজ্জাদ জহীর, শ্রীকুরুমডি রাজাগোপালম, ডাঃ ভব... উপাধ্যায়, শ্রীশিউদান সিং চৌহান, শ্রীথেরুভট রমণের মতো হিন্দী, উর্দু, ... বাঙলা, অসমীয়া, তামিল ও মালয়ালম ভাষার সাহিত্যিকবৃন্দ। সঙ্গী...

ক্ষেত্রে সঙ্গীতাচার্য পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর এবং আমাদের শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মণ ও তাঁর সুযোগ্যা পত্নী শ্রীমতী মীরা দেববর্মণ এবং নৃত্যকলার দিক থেকে ছিলেন 'ভারতনাট্যম' নৃত্যশিল্পী কুমারী ভারতী। এ ছাড়া শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মীরা ছিলেন অনেকেই। এই নিয়ে আমাদের ১৩০ জনের ভারতীয় দলটি ছিল সম্মেলনের চতুর্থ বৃহত্তম দল।

শান্তি সম্মেলন শুরু হলো ৯ই জুলাই, বেলা নটায় মস্কোর বিখ্যাত হল অফ কংগ্রেসে। গত বছর নভেম্বর মাসে এইখানেই অধিবেশন হয়েছিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশ কংগ্রেসের—তাই এই নামকরণ। ক্রেমলিন এলাকায় এই বিশাল ছ-তলা প্রাসাদটি গড়া হয়েছে সম্প্রতি—একেবারে আধুনিকতম স্থাপত্যরীতিতে। পুরোদস্তর ছিমছাম, stream-lined এর চেহারা। সভা সম্মেলন ছাড়া ব্যালে, অপেরা, থিয়েটার বা কনসার্টেরও এখানে ব্যবস্থা হয়ে থাকে প্রায়ই। ভিতরে বসার আসন ৬০০০ মানুষের। মঞ্চ থেকে বক্তৃতা প্রথম থেকে শেষ সারি পর্যন্ত, ঘরের সর্বত্রই শোনা যায় সমান জোরে প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরেই। আর এখানে রয়েছে পৃথিবীর ছ-টি প্রধান ভাষায় যুগপৎ তর্জমার সুবন্দোবস্ত। দেখে শুনে আমরা, ভারতবাসীরা তো তাজ্জব বনতেই পারি—আশ্বস্ত হই যখন দেখি 'নিউ স্টেটসম্যান'-এর ডাকসাইটে ভূতপূর্ব সম্পাদক কিংসলি মার্টিনকেও এই নিয়ে উচ্ছ্বসিত হতে। তিনিও এসেছিলেন আমাদের মতোই এই সম্মেলনে যোগ দিতে।

অধিবেশন শুরু হতে সামনে তাকিয়ে দেখি মঞ্চের উপরকার বিরাট পর্দায় আঁকা পিকাসোর কপোত—অবশ্য নতুন ছাঁদে। অস্ত্রসজ্জার ধ্বংসাবশেষের উপরে পাখা-মেলা, নিশ্চিন্ত, লঘুভার অথচ অমিতশক্তিধর তার অপরূপ ভঙ্গিমা (কদিন মস্কোর পথেঘাটে, দেওয়ালে ও ঝুলন্ত পর্দায় দেখা গেল এরই প্রতিচ্ছবির অজস্র ছড়াছড়ি)। দু-পাশে ও ছবির তলায় ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, জার্মান, স্প্যানিশ, চীনা ও আরবি ভাষায় লেখা সম্মেলনের নাম—World Congress for General Disarmament and Peace।

২৫০০ মানুষ ক্রমে আসন গ্রহণ করলেন নিজ নিজ দেশের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে। আমাদের ডাইনে ফরাসি ও ব্রিটিশ, পিছনে ইন্দোনেশিয়ান ও বাঁ পাশে ইটালিয়ান ও জাপানি দল। দু-চোখ ভরে দেখলাম বিশাল কক্ষটি জুড়ে সাদা-কালো-হলদে-বাদামী মানুষের মেলা, বিচিত্র তাদের ভাষা, মুখের ধাঁচ ও সাজসজ্জা। বিশেষ করেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করলেন কৃষ্ণকায় আফ্রিকানেরা।

তাঁদের পুরুষদের কালো পাথরে খোদাই করা বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ, একটি কাঁধ ও বাহু অনাবৃত, অন্যটির উপর দিয়ে হাল্কাভাবে জড়ানো উজ্জ্বল কালো-হলদে রঙের বিচিত্র নক্সা কাটা শাল—রোমান টোগার মতো। ওগিঙ্গা ওডিঙ্গার মতো নেতাদের আবার আছে মাথায় জমকালো শিরস্ত্রাণ, হাতে পশুলোমের চামর। আফ্রিকান মেয়েরাও এসেছেন দলে দলে, নানা দেশ থেকে। তাঁরাও চোখ-ঝলসানো চড়া রঙের সুন্দর পোষাকে সজ্জিত। চলনে-বলনে তাঁদের কিছুমাত্র সংকোচের বিহ্বলতা নেই। আফ্রিকার জাগরণের দীপ্তিতে তাঁরা প্রত্যেকেই সমুজ্জ্বল।

দেখতে দেখতে নাম ডাকা শুরু হয়ে গেল সভাপতিমণ্ডলীর—প্রত্যেক দেশ থেকে অন্তত একজন, প্রধান প্রধান দেশগুলি থেকে তিনচারজনকেও বরণ করা হলো সভাপতিত্বে। তাঁরা উঠে এসে মঞ্চে আসন গ্রহণ করতে লাগলেন একে একে। আমাদের ভারতবর্ষ থেকে নির্বাচিত হলেন শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু, দেওয়ান চমনলাল, ডাঃ তারাচাঁদ ও ডাঃ পি. এন. সাপ্রু মহাশয়। সভাপতিমণ্ডলীতে কিছু চেনা মুখও নজরে পড়ল, সাত বছর আগে যাঁদের দেখেছিলাম হেলসিঙ্কিতে। অধ্যাপক বার্নাল ছাড়া দূর থেকে চিনলাম কিউবার জাতীয় কবি নিকলাস গিলেন, সোভিয়েত লেখক এরেনবুর্গ ও কর্নিচুক, জার্মান লেখিকা আনা সেগার্স, আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের নেত্রী ফরাসি বিজ্ঞানী মাদাম ইউজিন কতঁ, জাপানের দুই অধ্যাপক হিরানো ও ইয়াসুই এবং বহুদিনের পরিচিত সিংহলের ভিক্ষু শরণঙ্করকে।

হঠাৎ তীব্র বেদনার আঘাতে মনে পড়ে গেল যে মনীষীদের এই মেলায় একেবারে কেন্দ্রের আসনটি আজ শূন্য—ফ্রেডারিক জোলিও কুরির। সাত বছর আগে সেই কর্মচঞ্চল, অস্থির মানুষটিকে দেখেছিলাম হেলসিঙ্কি শান্তি সম্মেলনের মহানায়করূপে। দু-দিন পরেই তাঁকে সেবার দেশে ফিরতে হয় ডাক্তারের পরামর্শে। পারমাণবিক বিভীষিকার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের সেই নির্ভীক নায়কের দেহ পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়াজনিত রোগে জর্জর হয়েছিল কয়েক বছর ধরে। ১৯৫৮ সনে স্টকহলম শান্তি সম্মেলনে তাই তাঁর পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি—এর কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা পেলাম তাঁর নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ। হেলসিঙ্কির কথা মনে পড়তেই তাই মনটা বেদনায় ভরে উঠল। মনে হলো যেন আসন্ন মৃত্যু ভিতর থেকে জানান দিচ্ছিল থেকে থেকে—তাই তাঁর সেদিনকার অস্থিরতা, কোনোমতে আরব্ধ কর্মের নিষ্পত্তি ঘটানো-

তাগিদে। সে অস্থিরতার আজ ক্ষান্তি ঘটেছে চিরতরে—কিন্তু বিদ্যুতের মতো তার বেগ তিনি সঞ্চার করে গেছেন বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলনে।

আরো একটি চেনা মুখেরও দেখা পেলাম না এখানে—আর পাবও না কোনোদিন। বিখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিক ফাদিয়েভের সুদৃঢ়, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারা সেবার অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল হেলসিঙ্কিতে। তারপর হঠাৎ একদিন পাওয়া গেল তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর। হয়তো বা পুরনো দিনের দেনা এমনিভাবেই শোধ করলেন ফাদিয়েভ, কিন্তু তাতে সান্ত্বনা কোথায়?

গতবার যাঁদের দেখেছিলাম তার মধ্যে এবার সম্মেলনে দেখা পেলাম না চীনের উপরাষ্ট্রপতি কুও মো-জো, উত্তর কোরিয়ার দেশনায়িকা পাক দেন আই, ফরাসি সাহিত্যিক ভেরকর, ব্রেজিলের ঔপন্যাসিক জর্জ আমাদো, চেক লেখক জঁ। ব্রদা, নিউজিল্যাণ্ডের রিউই এ্যালি এবং হাঙ্গেরির সাহিত্য সমালোচক জর্জ লুকাচের।

আলোচনার সূত্রপাত করলেন এবার বিশ্বশান্তি সংসদের সভাপতি অধ্যাপক বার্নাল। দেশে বিদেশে তাঁকে বহুবার দেখেছি এবং দেখা হলেই নিঃসঙ্কোচে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়েছি। কারণ বিজ্ঞান ছাড়াও নানা বিষয়ে অসামান্য পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও অধ্যাপকের আচরণ ও কথাবার্তায় এমন একটা সহজ অমায়িকতা আছে যাতে আমাদের মতো অতি সাধারণ লোকেও তাঁর নাগাল পেতে পারে অনায়াসে। তাঁর বিচিত্র ও অসাধারণ কর্মক্ষমতার কথা ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মুখে শুনেছি—এক নাগাড়ে ১২।১৩ ঘণ্টা কাজের পর যখন সকলেই ছাড়া পাবার জন্য উস্‌খুস্‌ করছেন, অন্তত ঘণ্টা দুয়েক বিরামের তাল খুঁজছেন, তখন কি রকম তিনি হঠাৎ প্রস্তাব করে বসলেন : "আমরা এখানেই কিছু কফি ও স্যাণ্ডুইচ আনিয়ে নিয়ে আসুন চালিয়ে যাই আমাদের কাজ।" অথচ কখনোই মনে হয় না তিনি প্রাণপাত করে খাটছেন। বরং তাঁর কাজকর্ম, কথাবার্তা ও চেহারার মধ্যে এমন একটা প্রশান্ত স্থৈর্য আছে যাতে তাঁকে মোটেই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরের এক অসাধারণ মানুষ মনে হয় না। তাঁর মস্ত বড় মাথাটি (তার ভিতরকার কথা বলছি না—অবশ্যই তা বলার অপেক্ষা রাখে না) দীর্ঘ, ঘন ও অবিন্যস্ত চুলে ঢাকা—কথা বলার সময়ে বারবার মুখের উপরে এসে পড়ে অবাধ্য চুলের গোছা। তাঁর কণ্ঠ মৃদু অথচ স্পষ্ট।

বার্নাল তাঁর ভাষণে সম্মেলনের স্বর বেঁধে দিলেন গোড়াতেই :

"মস্কোর এই সম্মেলন হচ্ছে নতুন ধরনের। অকপট ভাবেই এটি পরীক্ষা-মূলক। এখানে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই কখনো এর আগে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হননি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে একই দেশের প্রতিনিধিরা মেলেননি। এ কদিনে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে একযোগে কাজ করার কৌশল—আমরা যারা এসেছি নানা দেশ থেকে, নানা দল ও মতের বাহক। সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছনোর স্বার্থে আমাদের সংযত করতে হবে নিজেদের ভাবনা, কারণ আমরা ও আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে সত্যকার ও প্রচুর পরিমাণ জটিলতা ও মতভেদ।…কার্যকরভাবে এই সর্বপ্রথম শান্তি আন্দোলনের বিভিন্ন, বহুলাংশে স্বতন্ত্র ধারাগুলির প্রতিনিধিত্ব ঘটেছে এই সম্মেলনে : গোঁড়া শান্তিবাদী ও অহিংস অসহযোগে বিশ্বাসী থেকে শান্তির জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আস্থাশীলেরা পর্যন্ত।

"এখানে কেউ কেউ হিমযুদ্ধে এ পক্ষ বা ও পক্ষের সমর্থক। অন্য কেউ বা মনে করেন দু-পক্ষই সমান অপরাধী। অনেকে এসেছেন সাবেকী ও বেশ বদ্ধমূল সংশয় নিয়ে, তাঁদের আশঙ্কা রয়েছে উদ্দীপনাগ্রস্ত সমাবেশের তোড়ে বাধ্য হয়ে হিমযুদ্ধে এমনভাবে পক্ষভুক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা যাতে তাঁদের কোনো বিশ্বাস নেই।

"তাঁরা দেখবেন এমনটি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এখানে। হিমযুদ্ধে এ পক্ষ বা ও পক্ষের জয়লাভের জন্য আমরা উদ্বিগ্ন নই—আমাদের কাম্য হিমযুদ্ধের অবসান ঘটানোই।

"শান্তিপরায়ণতায় আমাদের কোনো একচ্ছত্র অধিকারের অভিমান নেই, কিন্তু আমরা মনে করি যে সীমাবদ্ধ ও কার্যত কিছুটা পরস্পরবিরোধী ঢং-এ বিচ্ছিন্ন আন্দোলন চালানোর পক্ষে পরিস্থিতি বড় বেশি গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা চাই—আমার কথাই বলছি এখানে, এসম্পর্কে আপনারাই পরে সিদ্ধান্ত করবেন—আমি চাই এমন একটা অবস্থা দেখতে যেখানে নানাধরনের আন্দোলন তাদের নিজস্ব খাতে প্রবাহিত হবে, কিন্তু অন্যেরা কি করছে তার খবর রাখবে, তাদের সঙ্গে যে ক্ষেত্রে মতের মিল হবে সেখানে সমর্থন জানাবে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ না করে সম্মেলিত করবে তাদের প্রয়াস। আমাদের সামনে এই সম্মেলনের কাজকর্মের ফলে এই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—এই আমার বিশ্বাস।"

বার্নালের বক্তৃতার পর শুরু হলো বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতাদের ভাষণ। একেবারে প্রথমই ডাক পড়ল ভারতবর্ষের। ভারতীয় দলের নেত্রী শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু অসুস্থ ছিলেন—সমস্ত 'হল' উৎকর্ণ হয়ে শুনল তাঁর মৃদু কণ্ঠের ভাষণ। কিন্তু যখন তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এই বলে :

"নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব। নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব করে তুলতেই হবে। দুনিয়ার মানুষকে তৎপর হতে হবে পথের সমস্ত বাধা অপসারণের কাজে। মানুষের মাথা আর হাত অস্ত্র বানায়—লক্ষ লক্ষ মানুষ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অবিলম্বে নিরস্ত্রীকরণ না ঘটলে এমন দিন আসবেই যখন সেই লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধ প্রস্তুতির কাজে অসহযোগিতা করবে, অস্বীকার করবে মৃত্যুশেল বানাতে। জনসাধারণের এই শক্তিই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, প্রতিশ্রুতি দেবেই যুদ্ধবর্জিত, অস্ত্রবর্জিত পৃথিবীর, আমাদের স্বপ্নের দুনিয়ার।"

তখন মৃদু হলেও তাঁর কণ্ঠ আশ্চর্য জোরালো শোনাল।

এরপর দু-দিন ধরে চলল সাধারণ অধিবেশন যেখানে নানাদেশের তরফ থেকে প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা ও বিশিষ্ট অতিথিরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে লাগলেন একে একে। এর মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে প্রথম দিনে বারট্রাণ্ড রাসেলের টেপ রেকর্ড মারফৎ পাঠানো বাণী। রাসেল ছিলেন এ সম্মেলনের অন্যতম আহ্বায়ক ও উদ্যোক্তা। তবে নব্বই বছরের জরাগ্রস্ত দেহ নিয়ে তিনি সম্মেলনে যোগ দিতে পারেননি—তাই এই বাণী। কিন্তু আশ্চর্যরকম স্পষ্ট ও জোরালো সেই কণ্ঠস্বর শুনলে কে বলবে তাঁর অত বয়স। তা ছাড়া চিন্তার স্বচ্ছতা বা ভাষার প্রাঞ্জলতার কথা তো বাদই দিচ্ছি। তিনি বললেন দু-পক্ষের আলাপ ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না কিন্তু উভয়পক্ষেরই সে আলাপ আলোচনা চালাতে হবে কোন মেজাজ নিয়ে? তাঁর মতে :

"আমি চাই পশ্চিমের তরফে যাঁরা আলোচনা চালাবেন তাঁদের প্রত্যেকেই যেন ঘোষণা করেন : 'কমিউনিজমের বিশ্বব্যাপী জয়লাভের চাইতে পারমাণবিক যুদ্ধ যে খারাপ এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।' আমি চাই পূর্বজগতের তরফ থেকে যাঁরা আলোচনা চালাবেন তাঁদের প্রত্যেকেই যেন ঘোষণা করেন : 'ধনতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী জয়লাভের চাইতে পারমাণবিক যুদ্ধ যে খারাপ এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।' যে কোনো পক্ষ থেকেই যাঁরা এমন ঘোষণা দিতে অস্বীকার করবেন তাঁরা মানবতার শত্রু এবং মানবজাতির বিলুপ্তির সমর্থক হিসেবেই নিজেদের প্রতিপন্ন করবেন।"

রাসেল ধাপে ধাপে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থার তদারকির ভার সামরিক জোট-বহির্ভূত দেশগুলির হাতে ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী এবং বর্তমানে শান্তি আন্দোলনের সব থেকে কার্যকর পন্থা হিসেবে এই দাবি নিয়ে দেশে দেশে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করলেন ভারতবর্ষের সম্ভাব্য ভূমিকার কথা।

দ্বিতীয় দিন দুপুরের দিকের একটি ঘটনা মনে গেঁথে রয়েছে। হঠাৎ কানে এলো বক্তা হিসেবে নাম ডাকা হচ্ছে পাবলো নেরুদার। কিন্তু কোথায় নেরুদা? সভাপতিমণ্ডলীর একজন বিশিষ্ট সদস্য হলেও কবিকে খুব কমই দেখা যেত তাঁর নির্দিষ্ট আসনে। তিনি হয় বসতেন তাঁর দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে, নয়তো বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করে বেড়াতেন এধারে ওধারে অথবা কাফিখানায়। তাই 'হল'-এ যখন তাঁকে পাওয়া গেল না তখন অগত্যা অন্য বক্তার ডাক পড়ল তাঁর জায়গায়। কিছুক্ষণ পর ফের শোনা গেল তাঁর নাম সভাপতির আসন থেকে। এবারে হাততালির বহর দেখে বুঝলাম কবিকে পাওয়া গেছে শেষ পর্যন্ত।

নেরুদাকে আগে দেখিনি যদিও তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন একবার। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মোটেই তাঁর চেহারা কবিসুলভ নয়। গোলগাল চেহারা, মাঝারি ধরনের ফরসা রঙ, মাথার উপরে চুল পাতলা হয়ে এসেছে অনেকখানি, চোখ দু-টি ছোট ছোট। কিন্তু তাঁর হাসি আশ্চর্যরকম উজ্জ্বল ও বুদ্ধিদীপ্ত। সব মিলিয়ে মনে হয় একজন অমায়িক ভদ্রলোক, তবে অসাধারণ বুদ্ধিমান।

কিন্তু কবি বোঝা যায় মুখ খুললেই। আমরা কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম তাঁর ছেলেবেলার কথা—শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, পথঘাট কাদায় ঢাকা, অভিভাবকদের জীবিকা অর্জন অনিশ্চিত, চারিদিকে শুধু শোষণ আর তার থেকে যুদ্ধবিগ্রহ। তবু মানুষ বেঁচে থাকে একটি মাত্র শব্দের উপরে ভর করে—আশা। বড় প্রিয় শব্দ এটি ল্যাটিন আমেরিকায়। কারণ এতে ভর না করলে মানুষ বাঁচে কি নিয়ে? তাই ল্যাটিন আমেরিকাকে যে বলা হয় 'আশার মহাদেশ', তা নিছক পরিহাস নয়।

চিলি তথা দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গত অবস্থা যখন আমাদের কাছে ছবির মতো প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ নেরুদার কণ্ঠ দৃপ্ত হয়ে উঠল আবেগে। কেন যুগ যুগ ধরে সইতে হবে মানুষকে এই লাঞ্ছনা? আশা কেন শুধু আকাশ-

কুসুমমাত্রই থাকবে আমাদের কাছে? কেন খাদ্য বস্ত্রের প্রাচুর্যে, রোগ নিরাময় শিক্ষা-দীক্ষার বিপুল ব্যবস্থাপনায়, নাচ গান কবিতার অজস্রতায় ঝরে পড়বে না আশা বর্ষার দাক্ষিণ্যের মতো?

পাবলো নেরুদা হঠাৎ নেমে এলেন মঞ্চ থেকে। দেশবিদেশের সারিসারি মানুষের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলেন দ্রুত পায়ে। সমস্ত 'হল' তখন দাঁড়িয়ে উঠেছে তাঁকে স্বাগত জানাতে। কেউ তাঁর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে, কেউ বা শুধু একটু স্পর্শ করছে তাঁকে। পিছনে পিছনে ধাওয়া করে যখন তাঁকে ধরলাম হলের বাইরে তখন দেখি ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিনিধিরা তাঁকে ঘিরে ধরেছে চারিদিক থেকে। কেউ হাতে হাত দিচ্ছে, কেউ জড়িয়ে ধরছে, কেউ বা চুমু খাচ্ছে—"পাবলো" "পাবলো" এ জয়ধ্বনির মধ্যে। বুঝলাম এখন কথা বলার চেষ্টা করা শুধু বৃথা নয়, অশোভনও বটে—এই প্রিয়সম্বর্ধনার সমারোহের মধ্যে।

নেরুদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলাম কদিন পরে। রবীন্দ্র মেলা উপলক্ষে আমরা কবির ছবি সমেত যে স্মারক-চক্র তৈরি করিয়েছিলাম তারই একটি ল্যাটিন আমেরিকার এই প্রখ্যাত কবির কোটে লাগাতে লাগাতে অনুযোগ করলাম তিনি আমাদের মেলায় আসেননি বলে। কবি স্মারক-চক্রটি তাঁর ঠোঁটে ছুঁইয়ে অপরাধ কবুল করলেন। বললেন নানা ধরনের কাজকর্মের চাপে অনেক সময়ে জরুরি কাজও হয়ে ওঠে না শেষ পর্যন্ত। তবে রাজনৈতিক কাজকর্মের ভিড়ে কবিতা চাপা পড়ে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই—সেটা অসম্ভব। সম্প্রতি কিছু লিখেছেন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে জানালেন নিশ্চয়। এও শুনলাম যে এ বছরই তাঁর কবিতার ইংরেজি তর্জমার বই প্রকাশিত হবে, তাতে থাকবে বেশ কিছু নতুন কবিতা।

নেরুদার সঙ্গে আর একদিন দেখা আমরা যে হোটেল ইউক্রাইনায় থাকতাম তার সামনেকার প্রশস্ত সিঁড়ির উপরে। তাঁর সঙ্গে সেদিন ছিলেন কিউবার দুই বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক—নিকলাস গিলেন ও মারিনেল্লো। এর মধ্যে গিলেনকে দেখেছিলাম হেলসিঙ্কিতে। কবি হিসাবে অনেকের মতে তিনি নেরুদার সমকক্ষ। দুই কবিরই খ্যাতি সারা ল্যাটিন আমেরিকা জোড়া। গিলেনকে হেলসিঙ্কির কথা বলে জানালাম যে *Mainstream* পত্রিকার দৌলতে তাঁর কয়েকটি কবিতার সঙ্গে আমরা পরিচিত। বিশেষ করে মেক্সিকোর বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সিকোয়েরজের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে হাভানার একটি প্রতিবাদ সভায় গিলেন ও নেরুদা যা বলেন ও যে কবিতা কটি পড়েন তার একটি

চমৎকার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ঐ পত্রিকায়। গিলেন ও নেরুদা দু-জনকেই দেখলাম মেক্সিকোর ঐ শিল্পীকে যে বর্বর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে তার জন্য বিশেষ বিচলিত।

গিলেনকে রবীন্দ্র স্মারক-চক্র দিতেই তিনি পাল্টা আমার কোটে পরিয়ে দিলেন তাঁদের বীর নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর চিত্রাঙ্কিত চক্র। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন যে তাঁর কবিতার ইংরেজি তর্জমা প্রকাশের কথা হচ্ছে। সুদূর ভারতবর্ষেও তাঁর কবিতা ভালোবাসার লোক আছে শুনে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গিলেন নেরুদার থেকে খাটো ও আমাদের মতোই তাঁর গায়ের রঙ। মুখে তাঁর হাসি লেগেই থাকে সর্বক্ষণ।

মারিনেল্লোর চেহারা বীরের মতো। কিউবা থেকে যে দলটি এসেছে, তিনি তার নেতা। তাঁর লেখার সঙ্গে আমরা এ দেশে পরিচিত নই। স্পেনের এক কবি যখন ম্যারিনেল্লো প্রসঙ্গে বললেন যে তিনি যেন হাতে রাইফেল নিয়ে লেখেন তখন বিশেষ কৌতূহল হলো তাঁর লেখা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে—আবার কিউবা কি সংকটের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে তারও পরিচয় পাওয়া গেল ঐ কথা থেকে। দুঃখের বিষয় এক্ষেত্রে কৌতূহল নিবৃত্তির কোনো ব্যবস্থা করতে পারি নি নানা কাজের ভিড়ে।

দ্বিতীয় দিনের বৈকালিক অধিবেশনের সব থেকে বড় ঘটনা অবশ্যই ক্রুশ্চভের বক্তৃতা। এই অধিবেশনটিতে সভাপতি ছিলেন বার্নাল স্বয়ং। ক্রুশ্চভের ভাষণ শোনার আগ্রহে সমস্ত 'হল' ও সভাপতিমণ্ডলীর মঞ্চ পুরোপুরি ভরতি হয়ে গেল দেখতে দেখতে। অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রুশ্চভ এলেন এবং নিচে, সাধারণ প্রতিনিধিদের মধ্যেই বসলেন। সভাপতি তখন জানালেন যে জেনিভায় যে ১৮টি শক্তির (এর মধ্যে ফ্রান্স যোগ দিচ্ছে না বলে কার্যত ১৭টি শক্তির) নিরস্ত্রীকরণ কমিটি চালু রয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই প্রধানমন্ত্রীর কাছে সম্মেলনের তরফ থেকে চিঠি গিয়েছিল আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে নিজ নিজ সরকারের মতামত জানাবার অনুরোধ করে। "এর ভিতরে ১০টি দেশের (ভারতবর্ষ সমেত) উত্তর পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ন-জন চিঠিতে তাঁদের বক্তব্য বলেছেন এবং দশম দেশটির প্রধানমন্ত্রী এখানে উপস্থিত রয়েছেন তাঁর মতামত জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। আমি এখন তাই সোভিয়েত সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি তাঁর বক্তব্য বলার জন্যে।" সমস্ত 'হল' দাঁড়িয়ে উঠে ও হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানাল সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীকে।

ক্রুশ্চভ তাঁর বক্তব্য পাঠ করলেন প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা ধরে। তাঁর বক্তৃতার অনেক কিছুই শুনেছি প্রকাশিত হয়েছে এ দেশের কাগজে—তাই তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। শুধু রাসেলের পূর্বোল্লিখিত বক্তব্য সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করলেন সেইটেই এখানে তুলে দিচ্ছি :

"লর্ড রাসেলের বাণীকে আমরা এক চরমপত্রদানের আবেদন হিসাবে ব্যাখ্যা করি না : হয় যুদ্ধ ও পারমাণবিক বিনাশ অথবা কমিউনিজমকে স্বীকৃতিদান অথবা উল্টো দিকে—হয় পারমাণিক যুদ্ধ নয় ধনতন্ত্রকে স্বীকৃতিদান। আমরা বিশ্বাস করি যে কোনো পক্ষই যদি তার মতাদর্শ ও নীতির জয়লাভের জন্য সশস্ত্রবাহিনী বাড়িয়েও, যুদ্ধের আশঙ্কা আরো ঘনিয়ে তুলে অগ্রসর হতে থাকে তা হলে নিশ্চিতভাবেই ঘটনাস্রোত এগিয়ে যাবে এক বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে। সমগ্র বিশ্বের সামনে আমরা ঘোষণা করছি যে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে বিজয়ী করার জন্য বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর নীতি আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ।

"আমরা এই ঘটনাকে ধরে নিয়ে শুরু করি যে পৃথিবীতে দু-ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে—ধনতান্ত্রিক নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলির এক ব্যবস্থা আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি, সমাজবাদী নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলির আর এক ব্যবস্থা। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক এক সংগ্রাম চলেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে সেই সংগ্রামকে বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার যুদ্ধে পরিণত করা উচিত নয় এবং ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার মারফতেই। সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশ তার সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করুক শান্তিপূর্ণ কার্যকলাপের মধ্যে। বিচারের মূল মাপকাঠি হলো : ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক, কোন ব্যবস্থা বেশি বৈষয়িক ও আত্মিক সুবিধা, জনসাধারণের জন্য উচ্চতর জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক মান এবং ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা যোগায় আর মানুষের স্বার্থে, জনসাধারণের স্বার্থে উৎপাদিকা শক্তি, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের দ্রুত পরিপুষ্টির নিশ্চয়তা দিতে পারে।"

ক্রুশ্চভের বক্তৃতায় শেষে আবার সবাই দাঁড়িয়ে উঠলেন অভিনন্দন জানাতে। ক্রুশ্চভ মাথা নামিয়ে প্রত্যাভিনন্দন জানালেন। তারপর বিদায় নেওয়ার উপক্রম করতেই সভাপতি তাঁকে অনুরোধ করলেন সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে এসে অন্য প্রধানমন্ত্রীদের উত্তর শুনতে। বলা মাত্র ক্রুশ্চভ রাজি হয়ে এসে বসলেন সভাপতি বার্নাল ও শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরুর মধ্যে। তারপর

মন্ত্রীদের বাণী পাঠ শেষ হলে আবার বিদায় চাইলেন সভাপতির কাছে। সভাপতি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই সভাপতিমণ্ডলীর শতাধিক সদস্য এগিয়ে এসে ক্রুশ্চভের সঙ্গে হাত মেলালেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন এরপরেই শেষ হয়ে গেল। তারপর দিন থেকে শুরু হলো কমিশন মিটিং। (ক) নিরস্ত্রীকরণের রাজনৈতিক ও টেকনিক্যাল সমস্যা (খ) নিরস্ত্রীকরণের অর্থনৈতিক ফলাফল (গ) নিরস্ত্রীকরণ ও জাতীয় স্বাধীনতা এবং (ঘ) নিরস্ত্রীকরণের সামাজিক, ধর্মীয়, আইনগত ও সাংস্কৃতিক দিক—এই চারটি ছিল কমিশনের বিষয়। তারপর শেষের দু-দিন ফের পূর্ণ অধিবেশন বসার পর সম্মেলন শেষ হলো ১৪ই জুলাই তারিখে।

চতুর্থ কমিশনের অন্তর্ভুক্ত সাংস্কৃতিক সাব-কমিশনে নীলমণি ফুকন, গোপাল হালদার, মুলকরাজ আনন্দ, বিষ্ণু প্রভাকর, সাজ্জাদ জহীর, ভগবতীশরণ উপাধ্যায় প্রভৃতি ভারতীয় সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমিও ছিলাম একজন সদস্য। সেখানকার কথাই বলব এখানে কিছুটা সবিস্তারে।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে গোড়াতেই কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া গেল। সব দেশের সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরই রকমসকম মোটামুটি একই ধরনের ঢিলেঢালা। অর্থাৎ সভায় দেরি করে আসা, এসেই পরিচিতদের টেনে নিয়ে আড্ডা জমানো, সভা পরিচালনার দায়িত্ব ঠিক কার উপরে, কর্মসূচীই বা ঠিক কি—সেসব ব্যাপারে অনির্দিষ্ট থাকা, অব্যবস্থার জন্য বারবার সকলেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটা, হঠাৎ কি জানি কেমন করে অবশেষে কোনোমতে সভা শুরু হওয়া, গোড়ায় গোড়ায় কেউ মুখ খুলতে না চাওয়া, তারপর হঠাৎ সবাই এক সঙ্গে মুখখোলা ও কিছুতেই মুখবন্ধ না করা! কিন্তু এ সবই চলে এমন চমৎকার একটা খুশি আবহাওয়ায় যে গুরুগম্ভীর কর্তব্যপরায়ণেরাও শেষ পর্যন্ত জোয়ারে গা ভাসাতে রাজি হয়ে যান সানন্দেই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এই রকম চমৎকার অব্যবস্থার পর টের পাওয়া গেল যে আমাদের সাংস্কৃতিক সাব-কমিশনের সভা শুরু হয়ে গেছে ফরাসি লেখক পিয়ের ব্লকের সভাপতিত্বে। নানা দেশের প্রতিনিধিরা একের পর এক উঠে নানা ধরনের প্রস্তাব করলেন—যুদ্ধ প্রচারের নিষিদ্ধকরণ, আন্তর্জাতিক মৈত্রীর উদ্দেশ্যে ইউনিস্কো প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে নিজ নিজ সরকার মারফৎ বা অন্যভাবে ব্যবহারের চেষ্টা, পাঠ্যপুস্তক নতুনভাবে রচনা, আন্তর্জাতিক শিল্পী দিবস পালন, আন্তর্জাতিক চিত্র বা ফিল্মপ্রদর্শনী, টেলিভিশন

ও রেডিওর মাধ্যমে শান্তি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বাণী প্রচার, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাহিত্যিক তথা সাংস্কৃতিক লেনদেনের নানারকম কার্যকর পন্থা নির্দেশ বা এ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় ইত্যাদির। এই সব গুরুতর প্রস্তাবের ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা হাল্কা কথা-কাটাকাটি বা বিতর্কের আবহাওয়াও জমে উঠেছিল থেকে থেকে। যেমন ব্রিটেনের বিখ্যাত সুরকার এলান বুশ যখন জানালেন যে অল্ডারম্যাস্টন মিছিলের আনুষঙ্গিক হিসাবে অথবা পোলারিস সাবমেরিন ঘাঁটি বা জার্মান সানৎসার বাহিনীর পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে বিলাতে সুন্দর সুন্দর গান রচিত হয়েছে এবং তিনি চান সেগুলিকে অন্যান্য দেশের শান্তির গানের সঙ্গে বদলাবদলি করতে, তখন এরেনবুর্গ বললেন প্রেমের গান বিনিময় করলে উদ্দেশ্য আরো বেশি সার্থক হয়ে উঠবে। এতে এলান বুশ গোড়ায় বেশ একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে যখন বোঝানো হলো যে এরেনবুর্গ আসলে বলতে চেয়েছেন যে শুধু শান্তির গান বলে চিহ্নিত গানগুলিই নয়, সব রকম ভালো গানেরই লেনদেন হওয়া উচিত আর পরে যখন দেখা গেল যে বুশ মহাশয়ের প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে গোটা প্রস্তাবের অঙ্গ হিসাবে তখন আনন্দে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। খুশি হয়ে বৃদ্ধ সুরকার আমাকে উপহার দিলেন তাঁর প্রিয় *Songs of Peace*।

নানা বক্তৃতা ও প্রস্তাবের ভিড়ের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার জনৈকা প্রতিনিধির কথাগুলি মনে পড়ছে। শ্রীমতী এলিজাবেথ রোয়াট বর্ণের দিক থেকে শ্বেতাঙ্গ কিন্তু সেই উৎকট বর্ণান্ধতার দেশে তিনি সংগ্রাম করছেন কৃষ্ণকায়দের পাশে দাঁড়িয়ে। ইনি একজন অভিনেত্রী। তাঁর বলার ধরন অত্যন্ত সহজ, আন্তরিক অথচ তেজস্বী। একটি লাইবেরিয়ান প্রবাদ শোনা গেল তাঁর মুখে : "To look at a friend you don't have to look down upon him or look upto him but just to look straight at him !" মানুষে মানুষে সেই সহজ মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁদের মৃত্যুপণ সংগ্রাম।

আর একজনের কথাও ভোলা সম্ভব নয়। মার্কস আনা একজন স্প্যানিশ কবির ছদ্মনাম, যদিও এই নামেই এখন তিনি সর্বাধিক পরিচিত। ফ্রাঙ্কোর সরকার তাঁকে তিনবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। প্রথমবার তিনি রেহাই পান বয়স কম বলে। পরের দুবারেই শাস্তি কমে প্রতিবারে ৩০ বছর অর্থাৎ মোট ৬০ বছর কারাদণ্ডে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আন্দোলনের চাপে ২২ বছর পরে সম্প্রতি তিনি বুর্গোস জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কারাগারে

রচিত তাঁর ছোট্ট একটি কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি সরকারী খবরদারি এড়িয়ে কোনোমতে বাইরে আনা সম্ভব হয়েছে। স্পেনের প্রতিনিধি হিসেবে এই কবি-যোদ্ধা এসেছেন বিশ্বশান্তি সম্মেলনে।

মার্কস আনাকে দেখলে কিন্তু এসবের কিছুই বোঝা যায় না—মনে হয় না রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অতীত তাঁর দেহমনের উপরে কোনো ছাপ ফেলেছে। রোগা কিন্তু রুগ্ন নয় তাঁর দেহ, শুধু সামনের চুল কিছুটা পাতলা। অদ্ভুত স্নিগ্ধ তারুণ্য তাঁর চেহারায়। তাঁর হাসিটি লাজুক ধরনের—দৃষ্টির একাগ্রতা ও গভীরতা থেকেই শুধু থেকে থেকে ধরা পড়ে যে তারুণ্যের অনভিজ্ঞতা অনেক পিছনে ফেলে এসেছেন মার্কস আনা।

দুই অধিবেশনের মাঝখানের সময়টুকুতে সেদিন তাঁকে ধরলাম। আমার পক্ষে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সব থেকে বড় অসুবিধে ছিল এই যে তিনি ইংরেজি জানেন না। কোনোমতে তাঁরই এক বন্ধুর সাহায্যে তাঁর কাহিনী কিছুটা শুনলাম। কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড কৌতূহল ভারতবর্ষ সম্পর্কে আর প্রবল আগ্রহ কবিতার ব্যাপারে—থেকে থেকেই বলেন এতদিন পরে বেরিয়ে আমারই তো প্রশ্ন করার পালা। কবিতা চাইতেই তিনি সাগ্রহে দুটি কবিতা দিলেন একটি মূল স্প্যানিশে; অন্যটি ইংরেজি তর্জমায়। তাঁর কবিতা ও জীবনী বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করব বলাতে তিনি খুশি হয়ে উঠলেন— ঠিকানা দিয়ে বললেন কপি পাঠাতে।

বিখ্যাত লেখিকা আনা সেগার্সে'রও নাগাল পেলাম ঐ ছুটির সময়টুকুতেই। আশ্চর্য লাগল যে এই সাত বছরে তাঁর চেহারার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সমস্ত চুল সাদা, ছোট ছোট চোখ দুটি থেকে জীবনের প্রতি টান ও মায়া যেন ঠিকরে পড়ছে। বয়স সত্ত্বেও কখনও এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকার মানুষ নন আনা সেগার্স—ঘুরে ঘুরে সর্বদাই তিনি আলাপ করছেন নানা মানুষের সঙ্গে। আশ্চর্য প্রখর তাঁর ব্যক্তিত্ব যার দরুণ সাত বছর আগে হেলসিঙ্কিতে "উনিই কি আনা সেগার্স" আমার এই প্রশ্নের জবাবে একজন তরুণ জার্মান লেখক পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন—"who else can she be!"

ইগ্নাসিও এগ্যোয়ের একজন মেক্সিকান চিত্রশিল্পী। তাঁর সঙ্গেও আলাপ এইখানে। মেক্সিকান চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জানালেন যে খুবই প্রতিকূল অবস্থা তাঁদের সামনে। মেক্সিকান খ্যাত বিখ্যাত ত্রয়ীর মধ্যে ডিয়েগো রিভেরা ও অরোজ্‌কো আজ মৃত, আর তৃতীয় জন সিকোয়েরজ খাটছেন আট বছরের কারাদণ্ড। চরম প্রতিক্রিয়াশীল

শাসন চলেছে দেশে। কাজেই সরকারী চাহিদার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল, মুরাল চিত্রশিল্পের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। শিল্পীরা তাই শহর ছেড়ে এধারে ওধারে ছড়িয়ে পড়েছেন যদিও যোগাযোগ রয়েছে তাঁদের মধ্যে। উড্‌কাটের কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে অবস্থাগতিকে।

জাপানী চিত্রশিল্পী কিওটাকা ওয়াজিমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল হোটেলেই, এখানে তাঁর সঙ্গে কিছুটা আলাপ করা গেল। ৪৭ বছরের এই শিল্পী সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে স্কেচ করে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছে জাপানের সর্বত্র, বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ রয়েছে খোলাখুলি— এসব কথা তাঁর মুখে শুনলাম। তাঁর সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা চালানো খুবই কঠিন—তাই কিছুক্ষণ পরে আর কথা না খুঁজে পেয়ে তিনি কোনোমতে জানালেন যে তিনি আমায় একটা স্কেচ দিতে চান আর তার মারফতই জানাবেন তাঁর বক্তব্য। ক-দিন পরে আমাদের হোটেলের সামনে প্রতিনিধিদের আনাগোনার সেই স্কেচটি এই সংখ্যা 'পরিচয়'-এই ছাপা হলো।

চতুর্থ দিন বিকেলে পৃথকভাবে লেখকদের সমাবেশ হলো সোভিয়েত লেখক ভবনে। পিয়ের ব্লক প্রস্তাব করলেন যে যেহেতু এখানে অনেক দেশের লেখকেরাই উপস্থিত তাই সভাপতিমণ্ডলীকে যথাসাধ্য প্রতিনিধিত্বমূলক করাই সমীচীন হবে।

প্রথমেই অবশ্য নাম করা হলো জ'াপল সার্ত্র, আনা সেগার্স, আর্টার লুণ্ডক্ভিস্ট, পাবলো নেরুদা, নাজিম হিকমৎ, কনস্ট্যানটাইন ফেডিন, এরেনবুর্গ, কার্লো লেভি প্রভৃতি বিশিষ্টতমদের। তারপর যখন সব দেশেরই এক বা একাধিক নাম করা হতে লাগল তখন অস্ট্রেলিয়ার তরুণ ঔপন্যাসিক ফ্রাঙ্ক হার্ডি ('পাওয়ার উইদাউট গ্লোরির' লেখক) হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে এক প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন "সভাপতিমণ্ডলী তাহলে 'হল'-এই বসুন আর আমরা যারা কয়েকজন সভাপতিমণ্ডলীভুক্ত হব না আমরা উঠে বসি মঞ্চের উপরে কারণ সভাপতিমণ্ডলীর যা আয়তন দাঁড়াচ্ছে তাতে মঞ্চের উপরে তার স্থান সংকুলান হবে না।" এতে চারিদিকে হাসির ধুম পড়ে গেল। সোভিয়েত কবি সিমনভ তখন বললেন "খামোখা সময় নষ্ট করার দরকার নেই। নাজিম হিকমৎকে সভাপতি করে কাজ সুরু করা হোক এখুনই।" তুমুল হাততালির মধ্যে অপ্রস্তুত নাজিম হিকমৎ সভাপতি নির্বাচিত হয়ে গেলেন আচমকা।

আলোচনা সুরু করলেন সার্ত্র। হেলসিঙ্কিতে তাঁকে দেখেছিলাম
থেকে আর শুনেছিলাম তাঁর আশ্চর্য বক্তৃতা। নাগাল পাওয়ার আগেই
সেবার ফিরে গিয়েছিলেন দেশে। এবারে ঐ হলের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে
করলাম। বেঁটেখাটো মানুষ জাঁ পল সার্ত্র—একটা পা একটু টেনে টেনে
যেন। তাঁর লেখা পড়ে যেমনটি মনে হয়েছিল তার সঙ্গে মোটেই মিলল না
চেহারা। তবে একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে চোখে মুখে।
তাঁর খাতির দেখলাম অসাধারণ, তবু নম্র অমায়িক ও সহজ তাঁর আচরণ।

সার্ত্রকে যখন বললাম যে তিনি আমাদের রবীন্দ্রমেলায় না আসায়
সকলেই অত্যন্ত হতাশ হয়েছি তখন তিনি জানালেন "দুর্ভাগ্য আমার
গোড়ায় ভেবেছিলাম পারব—সে কথা জানিয়েও ছিলাম। তারপর
উঠলাম না কোনোক্রমেই।" জানা গেল তাঁর ব্যস্ততার মূল কারণ আলজিরিয়া
সেখানকার রক্তাক্ত সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত হওয়ায় এবং আলজিরিয়া
মুক্তিলাভে দারুণ উল্লসিত তিনি। সে-কথা বলার সময় তাঁর চোখ মুখ দেখে
হয় যে সেটা যেন তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যেরও ঘটনা।

সার্ত্র বললেন ঠিক সাত মিনিট। খুব স্পষ্ট তাঁর চিন্তা আর তাই বলার
তীক্ষ্ণ ও সোজাসুজি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথিবীতে যথেষ্টই ভাগাভাগি রয়ে-
বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতির মধ্যে। এরই সুযোগ নেয় যুদ্ধবাজে-
তারা যুদ্ধের সাফাই হিসেবে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি রক্ষার দোহাই পাড়ে।
যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কেন, প্রত্যেক জাতির
বৈশিষ্ট্যের ছাপও থাকবে—তার থেকেই আসে তার প্রাণরস। কিন্তু
বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি সংস্কৃতির আরো একটি দিক থাকে—সেটি তার
ব্যাপকতা। আজকের দিনে বিচিত্র সংস্কৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ
প্রত্যেক সংস্কৃতির এই সর্বব্যাপী দিকটার উপর জোর দিতে হবে। তা
গড়ে উঠবে ঐক্য এবং যুদ্ধবাজেরা তখন আর বিশিষ্ট কোনো সংস্কৃতি রক্ষার
তুলে কাজ হাসিল করতে পারবে না আজকের মতো। সার্ত্র তাই প্রস্তাব
যত শীঘ্র সম্ভব আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের আয়োজন করা হোক এই

মোটের উপরে সার্ত্রের এই বক্তব্য ও প্রস্তাবের উপরেই চলল আলোচনা
ইটালির সাহিত্য সমালোচক জিয়ানকার্লো ভিগরেল্লি জানালেন যে
'ইওরোপিয়ান কমিউনিটি অফ রাইটার্স' নামে ইওরোপীয় লেখকদের
প্রতিষ্ঠানটি গড়েছেন তাতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক নির্বিশেষে

দেশের লেখকেরা ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মোটেই ইওরোপীয় লেখকদের পৃথিবার অন্য লেখকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা নয়। তিনি ঘোষণা করলেন আফ্রোশীয় দুনিয়া এবং আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার লেখকদের সঙ্গে শুধু যোগাযোগ করতেই যে তাঁরা উৎসুক তাই নয়, তাঁরা চান এই সকলকে মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত এক কনফিডারেশন গড়ে তোলা।

এরেনবুর্গ বললেন "সার্ত্র প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন শুধু যুদ্ধের সম্পর্কে প্রস্তাবই নেবে না—তাতে শুরু করতে হবে লেখা ও লেখক সম্পর্কিত আলোচনাও। মনে রাখতে হবে আমরা বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার উন্নতি থেকে পেছিয়ে রয়েছি—এই একপেশে অগ্রগতি অস্বাভাবিক। হয়তো ঠাণ্ডাযুদ্ধের আবহাওয়াই এর জন্য দায়ী। আমাদের তাই কোটি কোটি পাঠক আছেন কিন্তু নেই কোনো নতুন টলস্টয়। পশ্চিম জগতেও নেই বালজাক, ডিকেন্স, স্তাঁদালের মতো প্রতিভা। কেন এই অবস্থা? এইসব সমস্যা নিয়ে ভাবার জন্য লেখকদের সম্মেলন ডাকা হোক সর্বব্যাপীভাবে। মনে রাখতে হবে আমাদের এই শান্তি সম্মেলনে সব লেখক এখনও যোগ দিতে রাজি নন।"

সাজ্জাদ জহীর জানালেন যে আফ্রোশীয় লেখক সংস্থা সংগঠিত হয়েছে কিছুদিন হলো কিন্তু তার সঙ্গে ইওরোপীয় বা অন্যান্য লেখকদের নিয়মিত যোগাযোগ এখনও স্থাপিত হয়নি। তাই সার্ত্র, ভিগরেল্লি ও এরেনবুর্গের প্রস্তাব খুবই সমর্থনযোগ্য। এ সম্মেলনে আমেরিকার লেখকদের উপস্থিতি অবশ্য আশানুরূপ নয়। তবু এখান থেকেই আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের প্রস্তাব নিতে হবে এবং তাঁর প্রস্তুতির জন্য একটি কমিটিও গঠন করতে হবে এখনই।

জহীর ছাড়া আমাদের তরফ থেকে শ্রীনীলমনি ফুকন, ডাঃ মুলকরাজ আনন্দ ও ডাঃ ভগবতীশরণ উপাধ্যায়ও তাঁদের বক্তব্য পেশ করলেন। ইটালি, গোয়াটে-মালা, নরওয়ে, ব্রিটেন, কিউবা, ভিয়েটনাম, স্পেন, চিলি, হাইটি, পশ্চিম জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রীস, ইরান, হাঙ্গেরি, পূর্ব জার্মানি, ঘানা, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, নেপাল প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরাও বললেন একে একে। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের প্রস্তাব গৃহীত হলো শুধু সর্বসম্মতিক্রমে নয়, সকলের বিপুল উল্লাসের ভিতরে। আর প্রস্তুতির জন্য যে কমিশন গঠিত হলো তার মধ্যে থাকলেন জাঁ পল সার্ত্র, কার্লো লেভি, আনা সেগার্স, পাবলো নেরুদা, নাজিম হিকমৎ প্রভৃতি বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ। ভারতবর্ষ থেকে নাম রাখা হলো ডাঃ মুলকরাজ আনন্দের।

সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল আগামী বছর এই বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে রোমে।

লেখকদের এই সভা প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা লিখে শেষ করি। বিরতির সময়ে আমি নানাদেশের লেখকদের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াচ্ছিলাম যথারীতি। আমার সঙ্গে ছিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি উৎসব কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত— *In Homage to Tagore* ও *Tagore and Man*-এর বেশ কয়েক কপি। এগুলি একটা টেবিলে রেখে আমি ঘুরছিলাম এধারে ওধারে। খানিক পরে ফিরে এসে দেখি জনকয়েক তরুণ নিবিষ্ট মনে ঐ বইগুলি পড়ছেন। গায়ের রঙ দেখে আফ্রিকান বোঝা গেল। আমাকে দেখে তাঁরা জানতে চাইলেন বইগুলি আমার কিনা। উত্তর পেতেই তাঁরা বললেন "আমরা এখানে রয়েছি ঘানা, গিনি, সুদান ও হাইটির লোক।" পরিচয়ও পেলাম প্রত্যেকের—দু-জন ঘানার কবি, জন ওকাই ও শ্রীমতী এলিজাবেথ স্পিও-সিয়ারগ্রা, একজন হাইটির কবি ও উপন্যাসিক রেনি দেপেস্ত্রে, একজন গিনির লেখক মারিও ... আর একজন সুদানের লেখক মোহেদ আহমেদ ওমেদ। এঁরা বললেন "আমাদের প্রত্যেককে না হলেও আমাদের চারটি দেশের জন্য চারটি বই তুমি দিতে পারবে কি? আমাদের বিশেষ দরকার এই বই-এর। তোমাদের কবি সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানি কিন্তু জানার আগ্রহ আমাদের প্রত্যেকের প্রবল। *Tagore and Man*-এ কবির লেখা পড়ে আমরা অবাক হয়ে গেছি। যদি দিতে পারো তবে এই সব লেখার সঙ্গে আমরা আমাদের দেশের মানুষের পরিচয় ঘটাব নিশ্চয়ই।"

প্রস্তাবে সম্মতি জানাতেই এদের মুখ ভরে গেল হাসিতে। তারপর যখন এঁদের প্রত্যেকেরই কোটে এঁটে দিলাম কবির শতবার্ষিক স্মারকচক্র তখন এঁদের আনন্দ দেখে কে। আমার হাত ধরে তাঁরা বারবার বলতে লাগলেন "তুমি আমাদের সত্যিকারের বন্ধু!" আমাদের দেশে এখন যা লেখা হচ্ছে— বিশেষ করে কবিতা ও ছোট গল্প— তার ইংরেজি তর্জমা পাঠাবার জন্যও এঁরা বিশেষ অনুরোধ জানালেন বারেবারে।

সুদানের তরুণ কবির কাছে শুনলাম যে বিখ্যাত সুদানী কবি, ... শির এল হাসান রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভক্ত। তিনি নাকি কবির রচনা থেকে তর্জমা করছেন নিজ ভাষায়।

আফ্রিকার হালের লেখকদের সংস্কৃতিতৃষ্ণার বোধ করি তুলনা নেই। ...

... এঁদের আকুল আগ্রহ সব কিছু জানবার, সব কিছু বুঝবার। আমাদের কবির কথা হয়তো আমাদের থেকেও এঁদের সম্পর্কে বেশি প্রযোজ্য :

"এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের ;
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার ;
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধারে
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।"

ফ্রান্সের জাঁ পল সার্ত্র থেকে ঘানার জন ওকাই—সবাই জড়ো হয়েছেন ...—জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি গভীর মমতায়। সুদূর বাঙলা দেশের এক জীবনপ্রেমিক তাই শান্তিতীর্থের এই পথিকদের উদ্দেশে আবার পাঠাচ্ছে তার নিবিড় ভালোবাসা।



ভারতীয় প্রতিনিধিদের কয়েকজন কিয়োটাকা ওয়াজিমা

René Depestre (Haitian poet and novelist)
Calle 41. No: 1058
Entre 32 y Av. Kohly
Nuevo Vedado.
La Habana. Cuba.

(Pablo Neruda) 1962

MARIO DE ANDRADE (Literary critic of Guinea)
(MPLA) Angola
B.P. 720 - Léopoldville
B.P. 800 Conakry

Mrs Elizabeth Spio-Garbrah from Ghana
c/o P.O.Box 1633
Accra Ghana
West Africa.

Cuba: Juan Marinello

ARTUR LUNDKVIST
S:t Eriksgatan 114
Stockholm
Sweden

Little children black and white
Hand in hand together we sing
Peace and friendship to all mankind
Let us ever remember 'Peace'.
E.S. Garbrah.

Inés Moreno (stage artist)
Flandes 1039 - Santiago - Chile.
Sud américa.

'পরিচয়'-এর প্রতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের শুভেচ্ছা

বিজ্ঞানীর মোহভঙ্গ

পিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর মানুষ হিসাবে আধুনিককালের অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে আমরা যে পরিমাণে পরিচিত হয়েছি বোধ হয় ঠিক সেই পরিমাণেই বিজ্ঞানীরা আমাদের কাছে অপরিচিত থেকে গেছেন। নীরব নিভৃত গবেষণাগারের বাইরে বিজ্ঞানীরা যে আমাদের মতোই রক্তমাংসে গড়া মানুষ একথা আমাদের মনেই পড়ে না। আমাদের অনেকেরই কাছে বিজ্ঞানীরা হলেন উগ্র যন্ত্রসাধক, সহস্র সূর্যের অমিত তেজের নিয়ন্ত্রা, লোক-ক্ষয়ংকর মহাকালের সমপর্যায়ভুক্ত। তাঁদের কথা আমরা ভয়মিশ্রিত বিস্ময়, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা বিজড়িত ক্ষোভের সঙ্গে স্মরণ করি। সময় সময় এই বিস্ময়, এই ক্ষোভ ঘৃণায় যে পরিণত হয় না তা নয়। বিজ্ঞানীদের ও বিশেষ করে পরমাণু-বিজ্ঞানীদের এর জন্য মর্মপীড়া কম নয়। অথচ বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ এবং চতুর্থ দশকের শুরু পর্যন্ত পরিস্থিতিটা এই পর্যায়ে ছিল না। তখনও পর্যন্ত নীরবে নিভৃতে সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে গবেষণাগারের গজদন্ত মিনারে সত্যের জন্যই সত্যানুসন্ধানের নীতিতে বিজ্ঞানীরা ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী, অবাধে বৈজ্ঞানিক তথ্য, প্রকল্প প্রচারে একান্ত পক্ষপাতী। তখন প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের সাধনাই ছিল তাঁদের একমাত্র পবিত্র কর্তব্য।

জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতাদখলের (জানুয়ারি ১৯৩৩) ঠিক এক বছর আগে লর্ড রাদারফোর্ডের গবেষণাগারে গবেষণারত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জেমস্ চ্যাডউইক আবিষ্কার করলেন পরমাণুকেন্দ্রের অন্যতম মৌলিক কণিকা, তড়িৎ-ধর্মনিরপেক্ষ নিউট্রন (ফেব্রুয়ারি ১৯৩২)। নিউট্রন আবিষ্কৃত হবার পর, ১৯৩২ সালেই নিউট্রনের তড়িৎ-ধর্মনিরপেক্ষতার সাহায্যে পারমাণবিক শক্তি-উন্মোচনের সম্ভাবনার কথা বিজ্ঞানীমহলে প্রথম উত্থাপন করলেন তরুণ অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ফ্রিজ হাউটারম্যানস (Fritz Houtermans)। হাউটারম্যানসের বক্তব্যকে বিজ্ঞানীরা তখন তেমন গুরুত্ব কিন্তু দেননি।

Brighter than Thousand Suns. Robert Jungk.

এর তিন বছর বাদে স্টকহোমে (Stockholm) নোবেল প্রাইজ বক্তৃ
জোলিও কুরীও প্রায় একই কথা বললেন। জোলিও কুরীর বক্তব্য
বিজ্ঞানীরা ইচ্ছামতো বিভিন্ন মৌলের পরমাণুকে ভাঙতে এবং গড়তে
সক্ষম তখন পরমাণুকে ভেঙে তার মধ্যে বদ্ধ অপরিমেয় শক্তিকে মুক্ত
তাঁদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব বা অবাস্তব হবে না এবং এই অমিত শক্তি
কাজে লাগিয়ে বিশ্ববিধ্বংসী বিস্ফোরণও ঘটানো যেতে পারে। জোলি
এই ভবিষ্যতবাণীও উপেক্ষিত হলো। নিউট্রন আবিষ্কারের পর পরমাণুর
নিউট্রনের প্রভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বিজ্ঞানীদের লেগে গেল
আটটি বছর, অতিবাহিত হলো ১৯৩২ থেকে ১৯৪০ সাল। নিউট্রন আবি
হবার পর পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন অভিঘাতের ফলাফল সম্পর্কে গবে
শুরু হলো কেম্ব্রিজ, প্যারিস, রোম, জুরিখ, কোপেনহেগেন, বার্লিনের বি
গবেষণাগারে। জানা গেল নিউট্রন পরমাণু যখন ভাঙে, মৌলের মৌল
যখন ঘটে, তখন ছাড়া পায় অপরিমেয় শক্তি। পারমাণবিক শক্তির এই
মুক্তিটা ঘটে জড় ও শক্তির পারস্পরিক রূপান্তর সংক্রান্ত আইনস্টাইনের বি
সমীকরণ অনুসারে। ফরাসী বিজ্ঞানী জোলিও কুরী আর তাঁর স্ত্রী আই
কুরী দেখালেন যে অ্যালুমিনিয়ম ও অন্যান্য মৌলিক ধাতুর পরমাণুর
দ্রুতগামী নিউট্রনের অভিঘাত ঘটলে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তায় উদ্ভব হয়। ইতা
বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি ও তাঁর সহকর্মীরা দেখালেন, পরমাণু-কেন্দ্রে
অভিঘাত ঘটানোর আগে জল বা প্যারাফিনের মধ্যে চালিত করে দ্রুত
নিউট্রনদের যদি শ্লথগতি করে দেওয়া যায় তাহলে এই কৃত্রিম তেজস্ক্রি
বৃদ্ধি পায় শতগুণে। তাঁদের পরীক্ষায় আরও জানা গেল যে ইউরেনি
পরমাণুর কেন্দ্রে এই ধরনের শ্লথগতি নিউট্রনদের অভিঘাত ঘটলে বাহত এ
সম্ভবত কয়েকটি, নূতন মৌলের সৃষ্টি হয়। গবেষণাগারে এই নবজাত মৌল
নামকরণ হলো ইউরেনিয়াম-অন্তিক অর্থাৎ ট্রান্স-ইউরেনিক মৌল।
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বাহত (apparently), সম্ভবত-র (probably)
স্থান থাকতে পারে না। জার্মানির ফ্রাইবুর্গে (Frieburg) গবেষণারত
বিজ্ঞানী ওয়ালটার নোডাক (Walter Noddack) আর তাঁর স্ত্রী আইডা
নোডাক তাই নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে দিলেন, মোটেই ট্রান্স ইউরেনি
এগুলি পূর্ব পরিচিত কতকগুলি মৌলের রস-যমজ অর্থাৎ আইসোটো
নোডাক দম্পতির সিদ্ধান্ত হলো শ্লথগতি নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনি

পরমাণুর দ্বিভাজন ঘটার ফলে এই মৌলগুলির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু তরুণ বৈজ্ঞানিক দম্পতির সিদ্ধান্ত ফার্মি, হান প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ধর্তব্যের মধ্যে আনলেনই না, কারণ তাঁদের এই সিদ্ধান্ত ছিল পারমাণবিক রূপান্তর সম্পর্কিত প্রচলিত সনাতন সিদ্ধান্তের বিরোধী। নোডাক দম্পতির সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃতি পেল না তেমনি অন্যদিকে শ্লথগতি নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে উপজাত ইউরেনিয়াম-অন্তিক মৌলগুলির যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাও থামল না। ফ্রান্সে জোলিও কুরী, আইরিন কুরী ও তাঁদের যুগোস্লাভ সহকর্মী সাভিচ (Savatich), জার্মানিতে জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান, এফ্ ষ্ট্রাসমান (Strassman), এবং অটো হানের দীর্ঘকালের সহকর্মী অস্ট্রিয়ান মহিলা বিজ্ঞানী শ্রীযুক্তা লাইসে মাইটনারের (Lise Meitner) গবেষণার ফলে নিঃসন্দেহে জানা গেল যে নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়ম পরমাণু থেকে উপজাত ফার্মি-আবিষ্কৃত তথাকথিত ইউরেনিয়াম অন্তিক মৌলটি হলো বেরিয়ামের একটি রসজমজ অর্থাৎ আইসোটোপ। বিজ্ঞানীদের কাছে এই আবিষ্কার অত্যন্ত অভিনব ঠেকল। কারণ বেরিয়াম, যার পারমাণবিক ভার হলো ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভারের প্রায় অর্ধেক, ইউরেনিয়াম থেকে তার উদ্ভব হতে পারে কি ভাবে? অটো হান (Otto Hahn) ১৯৩৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর জার্মানির একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর এই অভিনব আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। জার্মানিতে হানের গবেষণা নিরুপদ্রবে, নির্বিঘ্নে ঘটেনি। ১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি হিটলারী জাতি-বিদ্বেষের কবলে পড়ে মাইটনার জার্মানি ছাড়তে বাধ্য হলেন। এর বিরুদ্ধে স্বয়ং হিটলারের কাছে ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক এবং হান আবেদন জানালেন কিন্তু কোনো ফল হলো না। আর্য জার্মানিতে অনার্য মাইটনারের ঠাঁই নেই। হান ক্ষুব্ধ হলেন কিন্তু প্রকাশ্যে কোনও প্রতিবাদ করলেন না। শুধুমাত্র মাইটনারের ওপর তাঁর অসীম আস্থা আছে, তিনি যে জাতিবিদ্বেষ-বিরোধী পরোক্ষে একথা প্রমাণ করার জন্যই ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে উপজাত বেরিয়াম আইসোটোপ সংক্রান্ত নূতন তথ্যগুলি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় পাঠাবার পর হান সেগুলিকে মাইটনারের কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠির মাধ্যমে সর্বপ্রথম পাঠিয়ে মাইটনারের মতামত জানতে চাইলেন। মাইটনার তখন আশ্রয় নিয়েছেন সুইডেনে. খ্রীষ্টমাস কাটানোর জন্য আছেন সমুদ্রতীরবর্তী একটি ছোট্ট শহর কুনগেলভে (Kungelv)। মাইটনার যখন হানের চিঠি পান তখন তাঁর কাছে

ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আধুনিক কালের প্রখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানী অটো রবার্ট ফ্রিশ (Otto Robert Frisch)। হানের চিঠি পাওয়ার পর মাইটনার অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কারণ কয়েক মাস আগে তিনিই তো হানের সহযোগিতায় এই গবেষণা শুরু করেছিলেন। এরপর ফ্রিশ আর মাইটনারের মধ্যে কদিন ধরে চলল হানের গবেষণার তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ, খ্রীষ্টমাসের সমস্ত ছুটিটাই মাটি হলো। ফ্রিশের সহযোগিতায় মাইটনার সিদ্ধান্ত করলেন যে একবিন্দু জল ক্রমশ বড় হতে হতে যেমন সমান দুভাগে ভেঙে যায়, নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেমিয়াম পরমাণুও অনেকটা সেই ভাবে প্রায় সমান দুটি ভাগে ভাঙে। ফ্রিশ সে সময়ে কোপেনহেগেনে নীল বোরের গবেষণাগারে গবেষণা করছিলেন। সুইডেন থেকে কোপেনহেগেনে ফিরে এসে যান্ত্রিক নীরিক্ষার সাহায্যে ফ্রিশ মাইটনারের তত্ত্বীয় সিদ্ধান্তকে নির্ভুল বলে প্রমাণ করলেন। ফ্রিশ-মাইটনারের সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সৃষ্টি হলো অভাবনীয় চাঞ্চল্য। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারগুলি থেকে জানা গেল শ্লথগতি নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙন সম্পর্কিত আরও কয়েকটি নূতন তথ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ায় যার ফলাফল হলো সুদূরপ্রসারী। ইতালির শ্রেষ্ঠ পরমাণু-বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি তখন সপরিবারে ইতালি ত্যাগ করে আমেরিকার নাগরিক হয়েছেন, ব্রিটেন প্রবাসী হাঙ্গেরীয় পদার্থবিজ্ঞানী লিও জিলার্ডও (Leo Dzilard) ব্রিটেন থেকে আশ্রয় নিয়েছেন আমেরিকায়। ফ্রান্স থেকে জোলিও কুরী আর তাঁর সহকর্মীরা, আমেরিকা থেকে অ্যাণ্ডারসন, ফার্মি, জিলার্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙনের স্বরূপ নির্ণয় করে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। তাঁদের পরীক্ষায় জানা গেল, একটি শ্লথগতি নিউট্রনের অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন যখন ঘটে তখন ইউরেনিয়াম সামান্য পরিমাণ বস্তুসত্তার অর্থাৎ ভর (mass) আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ অনুসারে রূপান্তরিত হয় তেজে (energy) এবং উদ্ভব হয় অত্যন্ত দ্রুতগতি আরও কয়েকটি নিউট্রনের। এই বাড়তি দ্রুতগতি নিউট্রনগুলির প্রত্যেকটিকেই যদি ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজনের কাজে লাগানো যায় তাহলে ত্বরিৎ-গতিতে নিমেষের মধ্যে ঘটানো যায় এমন একটি শৃঙ্খল-বিক্রিয়া (chain reaction) যার পরিসমাপ্তি হবে কল্পনাতীত চাপ ও তাপজনক কয়েক লক্ষ টন ডিনামাইটের সমতুল্য বিস্ফোরণে। খনিজ ইউরেনিয়ামের তিন রকমের রসযমজ অর্থাৎ আইসোটোপ পাওয়া যায়।

ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিদ্যুৎভার হলো বিরানব্বই। ইউরেনিয়ামের এই তিনটি আইসোটোপেরই বিদ্যুৎভার সমান অর্থাৎ বিরানব্বই ; আর এই বিদ্যুৎভার এক হওয়ার জন্যই তাদের রাসায়নিক গুণধর্মের মৌলিকত্বে কোনও তফাৎ নেই অর্থাৎ তারা পরস্পরের রসযমজ হয়েছে। তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু পারমাণবিক ওজনে। তাদের পারমাণবিক ভার অর্থাৎ ওজন যথাক্রমে হলো ২৩৮, ২৩৫ এবং ২৩৪। খনিজ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের শতকরা ৯৯·২৮২ ভাগই হলো ২৩৮ পারমাণবিক ওজনের ইউরেনিয়াম, বাকিটুকুর মধ্যে শতকরা ০·৭১২ ভাগ পরিমাণে পাওয়া যায় ২৩৫ পারমাণবিক ওজনের ইউরেনিয়াম। খনিজ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামে ২৩৪ পারমাণবিক ওজনের ইউরেনিয়ামের প্রাচুর্য আরও কম, শতকরা ০·০০৬ ভাগ মাত্র। বিজ্ঞানী নাইয়ার (A. O. Nier) ইউরেনিয়ামের এই তিনটি আইসোটোপকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করে দেখালেন যে শ্লথগতি নিউট্রন অভিঘাতে প্রায় সমান দুই ভাগে ভাঙে কেবলমাত্র ২৩৫ পারমাণবিক ওজনের ইউরেনিয়াম পরমাণু এবং ২৩৮ পারমাণবিক ওজনের ইউরেনিয়াম আইসোটোপ নিউট্রনটিকে আত্মসাৎ করে ধাপে ধাপে মৌলান্তরিত হয়ে পরিণত হয় যথার্থ ট্রান্স-ইউরেনিক মৌল প্লুটনিয়ামে। প্লুটনিয়ামের পারমাণবিক ওজন হল ২৩৯ কিন্তু তার পারমাণবিক বিদ্যুৎভার হল ৯৪। ২৩৯ পারমাণবিক ওজনের প্লুটোনিয়াম ২৩৫ পারমাণবিক ওজনের মতোই ভঙ্গপ্রবণ। শ্লথগতি নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙন-জাতীয় প্রচণ্ড বিস্ফোরণশীল ত্বরিৎ-গতি শৃঙ্খল-বিক্রিয়া সৃষ্টির তত্ত্বীয় দিকটি জোলিও কুরী সর্বপ্রথম আলোচনা করেন ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ সালে এবং এই শৃঙ্খল-বিক্রিয়াকে আয়ত্তে রেখে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারিক পদ্ধতি প্রথম উদ্ভাবন করেন তিনিই। হিটলার কবলিত জার্মানিতে হাউটারমানস হাইসেনবার্গ (Hissenberg), উৎস্যাকার (Weiszacker), অটো হান প্রমুখ যে সমস্ত তীক্ষ্ণধী বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেও শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিলেন তাঁদের কাছেও নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙনের কথা এবং ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙন থেকে উদ্ভূত শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার তত্ত্ব অজানা ছিল না। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে ও ১৯৪০ সালের প্রথম কয়েক মাস পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদানপ্রদান চলেছিল প্রকাশ্যে এবং অবাধে। তখনও পর্যন্ত অবাধে

এবং প্রকাশ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আদানপ্রদানের নীতিতে গোষ্ঠীগতভাবে বিজ্ঞানীদের প্রগাঢ় আস্থা, অটল বিশ্বাস এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁদের নিবূঢ় নিস্পৃহতা বিন্দুমাত্র কমে নি। নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙনজাত বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা প্রথম চিন্তা করেন আমেরিকা প্রবাসী হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী লিও জিলার্ড এবং এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে জিলার্ড স্বভাবতই অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁর এই আতঙ্কের মূলে ছিল তাঁর কৈশোরকালে হাঙ্গেরিতে বেলা কুন (Bela Kun) ও হোর্থির এবং জার্মানিতে হিটলারের অমানুষিক অত্যাচারের দুঃস্বপ্ন। হিটলার কবলিত জার্মানির তীক্ষ্ণধী বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রনায়কদের হুকুমে সামরিক প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্যে, কর্মপ্রচেষ্টায়, প্রযুক্তিগত দুরূহ বাধা জটিলতা অতিক্রম করে ত্বরিৎ-গতি-শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার মাধ্যমে নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙন-জাত বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক শক্তিকে পারমাণবিক বোমা উদ্ভাবনের কাজে যাতে লাগাতে না পারেন আর এই কাজে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি হিটলার-বিরোধী রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলির সাহায্য শত্রুপক্ষীয় জার্মান বিজ্ঞানীরা যাতে না পান সেই উদ্দেশ্যে জিলার্ড প্রথমেই মিত্রশক্তির বিজ্ঞানীদের মধ্যে পারমাণবিক শক্তি-সম্পর্কিত তাঁদের গবেষণাগুলি স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। কিন্তু জিলার্ড একদিকে যেমন এই আন্দোলন শুরু করলেন অন্যদিকে তেমনি আমেরিকার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগ যাতে ত্বরান্বিত হয় তার জন্যও চেষ্টা করতে লাগলেন। জিলার্ড মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন শত্রুপক্ষীয় জার্মান বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক শক্তির সামরিকীকরণের কাজে প্রযুক্তিগত বাধা অতিক্রম করে মিত্রপক্ষীয় বিজ্ঞানীদের চেয়ে ইতিমধ্যেই অনেক বেশি এগিয়ে যাবেন। কাজেই বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে জিলার্ড পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগ সম্পর্কে আমেরিকার রাষ্ট্রনেতাদের সচেতন করার অভিপ্রায়ে আইনস্টাইনকে মুখপাত্র করে এক আবেদনপত্র সরাসরি পৌঁছে দিলেন আমেরিকার তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের কাছে। আগস্টের গোড়ার দিকে জিলার্ড রচিত, আইনস্টাইন স্বাক্ষরিত এই আবেদনপত্র রুজভেল্টের ব্যক্তিগত বন্ধু এবং উপদেষ্টা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতি বিশারদ ব্যাঙ্কমালিক আলেকজাণ্ডার স্যাকস (Alexander Sachs) মারফত

রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের হস্তগত হলো ১৯৩৯ সালের ১১ই অক্টোবর। বিশ্বযুদ্ধের আসন্নকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুতগতিতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙন-জাত পারমাণবিক শক্তিসংক্রান্ত তত্ত্বীয় গবেষণাকে ত্বরান্বিত করার এবং পারমাণবিক কাজে কৃৎকৌশলগত যে সমস্ত জটিলতম এবং দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তার সমাধানের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং অসংখ্য তীক্ষ্ণধী বিজ্ঞানী, যন্ত্রকুশলীদের যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন আর এই প্রয়োজন সাধিত হতে পারে একমাত্র রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্যে ও কর্মোদ্যমেই—একথাও জিলার্ড তাঁর আবেদনপত্রে রুজভেল্টকে জানিয়েছিলেন। এই কর্মপ্রচেষ্টায় জিলার্ডের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন আমেরিকার দুজন উদ্বাস্তু নাগরিক, (পোলিশ ?) বিজ্ঞানী ইউজিন উইগনার (Eugene Wigner) ও এবং হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী, অদূর ভবিষ্যতে হাইড্রোজেন বোমা উদ্ভাবনের প্রধান উদ্যোক্তা, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উগ্র সমর্থক তীক্ষ্ণধী এডওয়ার্ড টেলার। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক লালফিতায় জিলার্ডের আশা সফল হতে লাগল প্রায় আরও দু-বছর। ১৯৪০ সালের ৭ই মার্চের এক চিঠিতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন সম্পর্কে জার্মান রাষ্ট্র-নায়কদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে দ্বিতীয়বার সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও, ১৯৪১ সালের জুলাই মাস নাগাদ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আমেরিকান সরকারকে পারমাণবিক বোমা তৈরির উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা জানিয়ে দেবার পরও এসম্পর্কে আমেরিকার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা শুরু হলো না। অবশেষে ১৯৪১ সালের ৬ই ডিসেম্বর জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণের ঠিক চব্বিশ ঘন্টা আগে পারমাণবিক শক্তির সামরিকীকরণে জিলার্ড প্রার্থিত বিপুল অর্থ এবং প্রযুক্তিগত সাহায্য করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট। সূত্রপাত হলো মানব সভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে সংকটময় ভবিষ্যতের, পারমাণবিক যুগের।

জিলার্ড-আইনস্টাইন আবেদনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-বৈজ্ঞানিক এই পটভূমি থেকেই, আমেরিকার উদ্বাস্তু নাগরিক, জুরিখের একটি খ্যাতনামা পত্রিকার সাংবাদিক, রবার্ট য়ুঙ্ক (Robert Jungk) তাঁর 'সহস্র সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল' (*Brighter than Thousand Suns*) বইটি আরম্ভ করেছেন, শেষ করেছেন পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের (atomic weapons) সম্ভাব্য ধ্বংসকারী ক্ষমতার পরিমাণ, পারমাণবিক শক্তির অসামরিক প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিপদাপদ, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা,

রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক দায়দায়িত্ব নির্ধারণের ... বার্ট্রাণ্ড রাসেলের উদ্যোগে যথাক্রমে ১৯৫৬ সালের জুলাই, ১৯৫৭ ... এপ্রিল এবং ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত তিনটি 'পাগওয়াশ' (Pugwash) সম্মেলনের বিবরণ দিয়ে। বইটিতে পরিশিষ্ট হিসাবে ... হয়েছে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ অসামরিক বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ ... আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পর্কে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের কাছে ... বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী নীল বোরের স্মারকলিপিটি এবং ১৯৪৫ সালের ... মাসে আমেরিকার তৎকালীন সমরসচিবের কাছে নিবেদিত জেমস ... (James Franck) রচিত এবং জেমস ফ্রাঙ্ক, লিও জিলার্ড প্রমুখ ছয় জন ... পরমাণু-বিজ্ঞানীর স্বাক্ষরিত পারমাণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ এবং ... নৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-শান্তির অজুহাতে যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানে পারমাণবিক বোমা বর্ষণ না করেন, তার সপক্ষে যুক্তি-সম্বলিত বিবৃতি ...

রবার্ট য়ুঙ্কের জন্মভূমি হলো জার্মানি, তাঁর বৃত্তি সাংবাদিকতা ... চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী ... শান্তিবাদী। তিনি ইহুদি এবং তাঁর রাজনৈতিক মতামত রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী এই অপরাধে নাৎসি সরকার তাঁর জার্মান নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়ে ১৯৩৩ সালে তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। নাৎসি উৎপীড়নের যাবতীয় দুর্ভোগ তিনি ভুগেছেন। য়ুঙ্কের আলোচ্য বইটিকে একরকম বিজ্ঞানীদের মানবিক (moral) এবং রাজনৈতিক ইতিহাস বলা যায়। ... ইতিহাস রচনায় য়ুঙ্কের মুন্সিয়ানা অদ্ভুত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জেনেভা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের আধুনিক কালের যে সমস্ত বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক এবং হাইড্রোজেন বোমা উদ্ভাবনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত পরিচয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের এবং সরকারী বেসরকারী নথিপত্রের ভিত্তিতে য়ুঙ্কের বই লেখা হয়েছে। জাপান এবং জার্মানির প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানীদের ... তথ্যও এর মধ্যে বাদ পড়েনি। কিন্তু একমাত্র পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইনফেল্ড (Infeld) ছাড়া অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিজ্ঞানীদের ... তথ্য সম্পর্কে য়ুঙ্ক নীরব। ১৯১৮ থেকে ২৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরবর্তীকালে কেম্ব্রিজ, মিউনিখ, কোপেনহেগেন, গটিংগেন

(Gottingen) বহির্জগতের যুদ্ধোত্তরকালীন রাষ্ট্রনৈতিক রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থেকে রাদারফোর্ড, আরনল্ড সমারফেল্ড (Arnold Sommerfeld), নীল বোর (Niels Bohr) ম্যাকস বোর্ন (Max Born), জেমস ফ্র্যাঙ্ক (James Frank), ডেভিড হিলবার্ট (David Hilbert) প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত প্রবীণ পদার্থবিজ্ঞানীরা এবং তাঁদের সহকর্মী তরুণ গবেষক-মণ্ডলীর সহায়তায় নিত্য নূতন আবিষ্কারের উন্মাদনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার গজদন্ত মিনারে নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন করতেন; আইনস্টাইন, ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক, কুরী দম্পতি, রাদারফোর্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের ফলে পদার্থের গঠন, জড়ের স্বরূপ, পরমাণুর সংযুতি সংক্রান্ত সনাতনী ধারণা দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে নতুন নতুন মতবাদের উদ্ভব হচ্ছে, তার মানবীয় দিকটি লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁদের গবেষণার প্রযুক্তিগত প্রয়োগ ভবিষ্যতের রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে অচিন্ত্যনীয় সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে, আগামী দিনে তাঁদের গবেষণাগারগুলিই সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব বিলোপের পীঠস্থানে পরিণত হবে একথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি। সে সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলির চতুঃসীমায় রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির আলোচনা বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক রীতিতে নিষিদ্ধ ছিল। কোনো বিজ্ঞানী, তা তিনি যতই বিশ্ববিখ্যাত হোন না কেন, এই রীতিভঙ্গ দোষে দোষী হলে তাঁর অপাংক্তেয়তা ছিল অনিবার্য। এর পর য়ুঙ্ক এঁকেছেন গটিংজেনে, তখনকার দিনের অখ্যাত বর্তমানে বিশ্ববিখ্যাত ওপেনহাইমার, জিলার্ড, টেলার, উইৎস্যাকার হাউটারম্যানস, হাইসেনবার্গ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের ছাত্রজীবনের ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ সালের সেই আনন্দমুখর, হাস্যোজ্জল দিনগুলির চিত্র। কিন্তু গটিংজেনের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ, মধ্যযুগীয় নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা রাজনীতির দাবদাহ থেকে বিজ্ঞানীদের বাঁচাতে পারল না। হিটলারশাহী-জাতিবিদ্বেষের বলি হতে শুরু করলেন আইনস্টাইন, ফ্রাঙ্ক প্রমুখ খ্যাতকীর্তি জার্মান বিজ্ঞানীরা। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সৌভ্রাত্রের মূলে কুঠারাঘাত আরম্ভ হলো; রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাতে জাতি, ধর্ম, দেশ, কাল, পাত্র নির্বিশেষে অবাধে বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান-প্রদানের আবহাওয়ায় ১৯৩২ সালে প্রথম সূচিত হলো সন্দেহ আর অবিশ্বাসের অন্ধকার। বিজ্ঞানের সঙ্গে রাজনীতির সংঘর্ষ বর্ণনা প্রসঙ্গে য়ুঙ্ক স্তালিনের আমলে বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ ও পদার্থতত্ত্ববিদ্ ল্যাণ্ডো (L. Landau),

জারোস্লাভ ফ্রেকনেল (Garoslav Freknel), পিটার ক্যাপিৎজা, জর্জ গ্যামো ভাভিলভ প্রমুখ বিশিষ্ট রাশিয়ান বিজ্ঞানী এবং রাশিয়ায় আশ্রয়প্রার্থী অন্যতম খ্যাতনামা অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ফ্রিজ হাউটারম্যানসের ওপর সোভিয়েত রাষ্ট্রতন্ত্র-পরিচালকদের উৎকট নিপীড়নের কথাও পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন এবং সে-সম্পর্কে কটাক্ষ করতেও ভোলেন নি। বইটির অন্যত্র যেখানে রাশিয়ার রাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গ বা রাশিয়ায় বিজ্ঞানচর্চার কথা এসেছে সেইখানে য়ুঙ্কের ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা বিসর্জিত হয়েছে। হিটলার-শাহী জাতিবিদ্বেষ নিপীড়িত, মুক্ত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী য়ুঙ্কের কাছে ফ্যাসিস্ট জার্মানি এবং সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, হিটলার স্তালিন সমপর্যায়ভুক্ত, সমান কণ্ঠনিষ্পেষক। বরং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হাইসেনবার্গ উইৎস্যাকার প্রমুখ যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা জার্মানিতে থেকে হিটলারের সামরিক উদ্যোগে বিনা প্রতিবাদে সাহায্য করেছিলেন য়ুঙ্কের ঐতিহাসিক সাক্ষী তাঁদের সপক্ষে গেছে। এ ধরনের ঐতিহাসিক বিচ্যুতির কথা বাদ দিলে বলা যেতে পারে য়ুঙ্ক প্রশংসনীয়ভাবে তথ্যনিষ্ঠ। যন্ত্রানুরাগী, নিরালম্ব সত্যাশ্রয়ী বিজ্ঞানীদের মানবীয় দিকটি, তাঁদের ভাবনা-চিন্তার কথাগুলি দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তোলার কাজে য়ুঙ্ক সফল হয়েছেন। যুদ্ধোত্তর কালে হিরোশিমা নাগাসাকির ওপর রাজনৈতিক কারণে পারমাণবিক বোমাবর্ষণ নিবারণে ব্যর্থকাম, হাইড্রোজেন বোমা উদ্ভাবনের বিরোধিতায় বিফল, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে, বিশ্বশান্তি স্থাপনে এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আমেরিকার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতির কদর্যতায় পরমাণু-বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্তির বিবরণ য়ুঙ্ক পরমাণু-বিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতির মাধ্যমে সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুটিত করেছেন। পরমাণু-বিজ্ঞানীদের আপৎকালিন জরুরি কমিটি (Emergency Committee)র কাছে আমেরিকার উদ্বাস্তু-নাগরিক নোবেল প্রাইজ বিজয়ী বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কের একটি উক্তিতে এই বিভ্রান্তির কারণ জানা যাবে। জেমস্ ফ্রাঙ্ক তাঁর উক্তিতে বলেছেন…"In general we [scientists] are cautious, and therefore tolerant and disinclined to accept total solutions. Our very objectivity prevents us from taking a strong stand in political differences in which the right is never on one side. So we took the easiest way out and hid in our ivory tower. We felt that neither the

good nor the evil applications were our responsibility." (পৃ ৪১)

আমেরিকার আর একজন উদ্বাস্তু নাগরিক বিখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টেলারের চিন্তা কিন্তু এর ঠিক বিপরীত। টেলারের নেতৃত্বে এবং পরিচালনাতেই আমেরিকায় হাইড্রোজন বোমা উদ্ভাবিত হয়েছে। টেলার মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হাইড্রোজেন বোমা অপরিহার্য। হাইড্রোজেন বোমার তল্পি বহনের জন্য টেলার বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজও অপাংক্তেয়। হাইড্রোজেন বোমার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন আমেরিকার আর একজন উদ্বাস্তু নাগরিক প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হান্স বেথে (Hans Bethe)। হাইড্রোজেন বোমার সঙ্গে জড়িত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হান্স বেথের কাছে হলো মানবিকতার প্রশ্ন, ধর্মনীতির প্রশ্ন।. ১৯৩২-৩৩ সালে রাজনীতির সঙ্গে বিজ্ঞানের সংঘর্ষের সূত্রপাতের সমকালে শ্লথগতি নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন সংক্রান্ত যুগান্তরকারী আবিষ্কারের মানবিক দিকটি য়ুঙ্ক সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তারপর য়ুঙ্ক সুদক্ষ কথাশিল্পীর নৈপুণ্যে রচনা করেছেন কিভাবে মার্কিন গুপ্তচর বিভাগের গোপন রিপোর্টে আস্থা স্থাপন করে জিলার্ড, ফার্মি টেলার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা তাঁদের এক সময়কার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হাউটার-ম্যানস্, উইৎস্যাকার, হাইসেনবার্গ প্রমুখ হিটলার-কবলিত বিশ্ববিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানীদের শুভবুদ্ধির ওপর বিশ্বাস হারালেন, কিভাবে হাইসেনবার্গ, হাউটার ম্যানস্ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা হিটলারের হুকুমে পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছেন এবং আমেরিকার আগেই পারমাণবিক বোমার প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল আয়ত্ত করে জার্মানি আমেরিকার ওপর সেই বোমা বর্ষণ করবে এই সম্ভাবনার অহেতুক তাড়নায় জিলার্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের সহায়তায় মার্কিন সরকারকে উদ্বুদ্ধ করে পারমাণবিক বোমা নির্মাণের কাজে লাগলেন; কিভাবে জার্মানির আত্মসমর্পণের পর পরমাণু-বিজ্ঞানীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সেই বোমা ফেলা হলো হিরোশিমা নাগাসাকির ওপর; কিভাবে লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র নিরপরাধী নিরীহ শিশু শ্রমিক নর-নারী হত্যা করে প্রতিষ্ঠিত হলো আধুনিক কালের পম্পেই—তার ইতিহাস। য়ুঙ্কের মতে উৎকট জাতি-বিদ্বেষের চণ্ডনীতির অংকুশাঘাতে যুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানি থেকে প্রথম শ্রেণীর তীক্ষ্ণধী বৈজ্ঞানিক এবং কৃৎকুশলী যন্ত্রবিদ বিতাড়ন-নির্বাসনের ফলে যুদ্ধের সময়ে জার্মানিতে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশলের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক জনবলের একান্ত অভাব, রাষ্ট্রীয় পোষকতায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার

সামরিকীকরণে নাৎসি সরকারের শৈথিল্য অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য, পারমাণবিক বোমা উদ্ভাবন ও তার সামরিক প্রয়োগের মতো জটিল কর্মকাণ্ডের উপযোগী যান্ত্রিক সাজ-সরঞ্জামের এবং পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যুদ্ধরত জার্মানির বিশিষ্ট পরমাণু-বিজ্ঞানীদের নেতিবাচক মনোভাব—এই চতুর্বিধ কারণের জন্যই মূলত যুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে জার্মানি পারে নি। হাইসেনবার্গ, উইৎস্যাকার, হান প্রমুখ খ্যাতনামা জার্মান বিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে নীরব এবং গোপন অসহযোগিতাকে পারমাণবিক বোমা উদ্ভাবনে জার্মানির ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে যুঙ্ক বিশ্লেষণ করেছেন। জার্মানির আত্মসমর্পণের পর জানা গেল পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমেরিকার চেয়ে জার্মানি অন্তত দু-বছর পিছিয়ে ছিল। এ সময়ে জাপানের পক্ষে পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রযুক্তির কথা চিন্তা করাও ছিল সাধ্যাতীত, স্বপ্নাতীত। হিটলারের পতন এবং জার্মানির আত্মসমর্পণের পর জার্মানির পক্ষ থেকে আমেরিকার ওপর পারমাণবিক বোমা বর্ষণের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা যখন আর রইল না তখন শান্তিকামী পরমাণু-বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক বোমার উৎপাদন, উদ্ভাবন বন্ধ রাখার দিতে চাইলেন অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই। তাঁদের যুক্তি হলো আমেরিকার ওপর পারমাণবিক বোমা বর্ষণে একমাত্র সক্ষম প্রবলতম শত্রু জার্মানি আত্মসমর্পণের পর সামরিক প্রয়োজনে পারমাণবিক বোমা উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যাবার সপক্ষে রাজনৈতিক এবং মানবিক (moral) কোনও কারণ থাকতে পারে না। কাজেই ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি জে. জেফ্রিসের (Z. Jeffries) সভাপতিত্বে পরমাণু-বিজ্ঞানীদের একটি সমিতি গঠিত হলো। এই কমিটি পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত যুগান্তরকারী নতুন আবিষ্কারগুলির ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিপদ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত কয়েকটি বিবরণী রচনা করে ১৯৪৪ সালে ২৮শে ডিসেম্বর এই বিবরণীগুলি দাখিল করলেন মার্কিন পারমাণবিক সংস্থার তদানীন্তন সামরিক অধিকর্তা জেনারেল লেসলি রিচার্ড গ্রোভসের (Leslie Richard Groves) কাছে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমিত এবং বিশ্বশান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ডেনমার্কের বিশ্ববিখ্যাত বর্ষীয়ান পরমাণু-বিজ্ঞানী নীল বোরও এই সময় ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ এবং আবেদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে জার্মানির আত্মসমর্পণের

পর পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগের সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করানোর জন্য বোরের এই চেষ্টা কিন্তু ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক কারণে রুজভেল্ট এবং চার্চিল দুজনেই বোরের কথায় কোনও গুরুত্ব দিলেন না। পারমাণবিক যুগের প্রাক-অভ্যুদয়কালীন এই নূতন পরিস্থিতি বিশিষ্ট পরমাণু-বিজ্ঞানীদের সনাতনী মনোবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তিকেও বিচলিত করল তীব্রভাবে, তাঁদের সামনে উপস্থিত হলো সনাতনী সেই জটিল প্রশ্ন—অতঃ কিম্! পরমাণু-বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন পারমাণবিক শক্তির প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল উদ্ভাবনের পথে এতদূর অগ্রসর হওয়ার পর এই প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করাটা হবে বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানের সনাতনী ইহনিষ্ঠায় অত্যন্ত অস্থির প্রজ্ঞার লক্ষণ। তাঁদের মতে যদি পারমাণবিক অস্ত্র উদ্ভাবন করে বিশ্ববাসীর কাছে পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রযুক্তির মহাপ্রলয়ংকর ফলাফলের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকা যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে যখন অন্য কোনো দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্রশক্তি গোপনে পারমাণবিক শক্তির প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল আয়ত্তে এনে আঘাত হানবে তখন তাকে প্রতিরোধ করার কোনও উপায়ই থাকবে না। ভবিষ্যতে অন্য কোনো রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে পারমাণবিক শক্তির প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল আয়ত্তে আনার এই নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা চিন্তা করলে এই শক্তিকে আয়ত্তে আনার কৃৎকৌশলগত সামরিক অগ্রসরতাকে কাজে লাগিয়ে তার সামরিক প্রয়োগের কার্যকরী পদ্ধতি আয়ত্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই. নান্য পন্থাঃ। এ সময় পরমাণু বিজ্ঞানীদের এই যুক্তির প্রধান সমর্থক ছিলেন নীল বোর। জার্মানির আত্মসমর্পণের পর পারমাণবিক শক্তির প্রযুক্তিগত গবেষণা চালিয়ে যাবার সমর্থনে আর একদল বিজ্ঞানী যুক্তি দিলেন পারমাণবিক গবেষণায় শক্তির যে নূতন উৎস আবিষ্কৃত এবং বিকশিত হয়েছে, মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে তা একান্ত অপরিহার্য। ভবিষ্যতে এই শক্তিকে সামরিক প্রয়োজনে বা ধ্বংসসাধনের কাজে ব্যবহার না করে যাতে সৃজনের কাজে লাগানো হয় সে সম্পর্কে তাহলে পারমাণবিক শক্তির প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল আয়ত্তে আনার উদ্দেশ্যে জার্মানির আত্মসমর্পণের পরও পারমাণবিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তিই টেকে না। পারমাণবিক শক্তির প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রথম পীঠস্থান শিকাগো (Chicago) বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাতুবিদ্যার গবেষণাগারের নিভৃত পরিবেশে যখন একদিকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে গোপনে এই ধরনের আত্মানুসন্ধান

চলেছে তখন অন্যদিকে ওক রিজ (Oak Ridge), হ্যান ফোর্ড (Han ford) এবং লস আলমোসের (Los Almos) পারমাণবিক কারানগরীতে কি [illegible] পারমাণবিক বোমাপ্রস্তুতির কাজ পূর্ণোদ্যমে দ্রুতগতিতে সমাপ্তির পথে, [illegible] বর্ণনা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ভাবে ফুটে উঠেছে য়ুঙ্কের লেখায়। [illegible] অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন কিভাবে সমর দপ্তরের প্রতিনি[illegible] রাষ্ট্রনীতি বিশারদ, বিস্ফোরণ-বিশেষজ্ঞ, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, আবহাওয়া-বিজ্ঞানী, পদার্থতত্ত্ব-বিশ্লেষণ-বিশারদদের নিয়ে গঠিত কমিটি রবার্ট জুলিয়াস ওপেনহাইমার, এনরিকো ফার্মি, আরথার কম্পটন প্রমুখ পরমাণু-বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় বিনা প্রতিবাদে পারমাণবিক বোমা-বর্ষণের লক্ষ্যস্থল হিসাবে নৈর্ব্যক্তিক হৃদয়হীনতায় বেছে নিলেন হিরোশিমা নাগাসাকিকে, জাপানের সমরায়োজনে [illegible] যাদের লেশমাত্র সম্পর্ক ছিল না। এঁরা আরও সিদ্ধান্ত করলেন, কালবিলম্ব না করে পারমাণবিক বোমাবর্ষণ করতে হবে, বোমাবর্ষণের পূর্বে লক্ষ্যস্থলের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে কোনও সতর্কবাণী উচ্চারিত হবে না এবং কি ধরনের বোমা সেটাও গোপন রাখতে হবে। জাপানের ওপর পারমাণবিক বোমা-বর্ষণের সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। কিন্তু যেভাবেই হোক জিলার্ড [illegible] সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারেন এবং জানতে পেরে অত্যন্ত বিচলিত [illegible] পড়েন কারণ পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগ সম্পর্কে আমেরিকান সরকারকে প্রথম উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তো তিনিই। তাই এবারেও জিলার্ড [illegible] সক্রিয় হতে হলো। ১৯৩৯ সালের ১১ই অক্টোবর আরব্যোপন্যাসের [illegible] মতো যে পারমাণবিক দৈত্যকে জিলার্ড ঘড়া থেকে বার করেছিলেন [illegible] একনায়কদের শায়েস্তা করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে, তাকেই [illegible] ঘড়ায় বন্দী করার তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। এবারও [illegible] সহায় হলেন আইনস্টাইন। তাঁরা পারমাণবিক শক্তির সমরিক [illegible] জাপানে পারমাণবিক বোমাবর্ষণের ফলাফল, ভবিষ্যতে সমগ্র মানব[illegible] ইতিহাসে যে নিদারুণ দুর্ভোগ ; আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে [illegible] জটিলতা অবিশ্বাসের সৃষ্টি করবে ; এ কথা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট [illegible] সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলের জন্য জাপানে পারমাণবিক বোমাবর্ষণের [illegible] বাতিল করে দেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে এক আবেদন জানালেন। [illegible] নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে জিলার্ড আইনস্টাইনের আবেদনপত্র দুটি খুলে [illegible] দেখবার আগেই ১৯৪৫ সালের ১২ই এপ্রিল রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৃত্যু [illegible]

মানবতার খাতিরে জিলার্ড-আইনস্টাইনের আবেদনের ভিত্তিতে জাপানের ওপর পারমাণবিক বোমাবর্ষণের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেবার সাহস রুজভেল্টের স্থলাভিষিক্ত নূতন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের হলো না। কারণ রাষ্ট্রনীতি অনভিজ্ঞ সরলপ্রাণ বিজ্ঞানীদের কথায় যে সমরায়োজনে মার্কিন করদাতাদের দুটি লক্ষ কোটি (দু বিলিয়ন) ডলার খরচ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে তার বাস্তব ফলাফল না দেখে তাকে বাতিল করে দিলে অর্থ অপব্যয়ের অপবাদে যে রাষ্ট্রীয় সংকটের সৃষ্টি হবে তার ঝুঁকি নেবে কে? জিলার্ড-আইনস্টাইনের মানবিক আবেদন তাই ব্যর্থ হলো। ১৯৩৯ সালে জিলার্ড পারমাণবিক শক্তি-মত্তায় জার্মানি অন্যান্য রাষ্ট্রে যে অত্যাচার যে দুর্ভোগের সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলেন, জার্মানি আত্মসমর্পণের পর মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের গতিবিধিতে জিলার্ডের মনে ১৯৪৫ সালে দেখা দিল সেই একই আশঙ্কা। এরপর ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই আকাশচুম্বী লৌহমঞ্চের ওপর রেখে পারমাণবিক বোমার বহু প্রতীক্ষিত পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ যখন লস আল-মোসের মরুপ্রান্তরে ঘটানো হলো তখন পারমাণবিক বিস্ফোরণের নিদারুণ প্রচণ্ডতায়, প্রলয়ংকর ভয়করতায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ভয়ে হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ দর্শনে মার্কিন পারমাণবিক সংস্থার অসামরিক অধিকর্তা আঠারোটি ভাষাভিজ্ঞ তীক্ষ্ণধী খ্যাত-কীর্তি বিজ্ঞানী জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহাইমারের মনোভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে য়ুঙ্ক বলেছেন, এ সময়ে ওপেনহাইমারের মনে পড়েছিল অর্জুনের বিশ্বরূপ অবলোকনের কথা, বিশেষ করে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের সেই শ্লোকটি যাতে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ সব্যসাচী অর্জুনকে বলছেন

দিবি সূর্য্য সহস্রভবেদ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সাদৃশী সা স্যাদ্ভাস্তস্য মহাত্মন ॥

পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত তেজস্ক্রিয় মেঘের সেই বিরাট, সেই ভীষণ ধূম-কুণ্ডলী সহস্র সূর্যের দীপ্তি নিয়ে ধীরে ধীরে বহুদূরে যখন মিলিয়ে গেল তখন ওপেনহাইমার স্মরণ করলেন ঐ একই অধ্যায়ের আর একটি শ্লোকাংশ, যার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা সাধারণ মানুষকে অনায়াসেই বলতে পারেন

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো, লোকান সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তাঃ

য়ুঙ্কের মতে জাপানের আত্মসমর্পণের পর পরমাণু-বিজ্ঞানীরা ন্যায়সংগতভাবেই আশা করেছিলেন পারমাণবিক গবেষণা সম্পর্কে যুদ্ধকালীন সামরিক

গোপনীয়তার নির্মম বিধিনিষেধের অবসান ঘটবে, পারমাণবিক কারাগার থেকে তাঁরা মুক্তি পাবেন এবং তাঁদের যুদ্ধ পূর্বকালীন অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ফিরে আসবে। কিন্তু তাঁদের এই আশা পূর্ণ হলো না। যুদ্ধের পরে তাঁরা দেখলেন, সামরিক বিধিনিষেধের কঠোরতা বিন্দুমাত্র তো কমলই না, অধিকন্তু সামরিক বিভাগ এবং গোয়েন্দা দপ্তরের আদেশে তাঁদের গতিবিধি কথালাপের গোপন ছায়ানুসরণের মাত্রা ক্রমশই বেড়ে গেল। সংস্থার সামরিক অধিকর্তা জেনারেল গ্রোভস তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন যে তিনি বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছেন সাধারণ মৃত্যুযন্ত্রণার তুলনায় পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়ার বিষ-বিকীরণ জনিত মৃত্যুযন্ত্রণা অধিকতর আরামপ্রদ—সমর দপ্তরের এই সীমাহীন হৃদয়হীনতায় পরমাণু বিজ্ঞানীরা পৌঁছলেন তাঁদের সহ্যের শেষসীমায়। এর পর ১৯৪৫ সালের শরতকালে মার্কিন সমরদপ্তর গ্রোভসের গোপন প্রচেষ্টায় আমেরিকান কংগ্রেসের সদস্য অ্যানড্রু মে (Andrew may) এবং সিনেটের সদস্য এডুইন জনসন (Edwin Johnson) এবং জেনারেল গ্রোভসের সহযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত পারমাণবিক গবেষণা সমরদপ্তরের নিব্যূঢ় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার উদ্দেশ্যে একটি বিল রচিত হলো এবং যথারীতি প্রচার না করেই সকলের অলক্ষ্যে মে-জনসন রচিত এই বিলটি সমর দপ্তরের কর্তারা যখন বিধিবদ্ধ করাবার চেষ্টা শুরু করলেন তখন সেটা বিজ্ঞানীদের কাছে উটের পিঠে শেষ কুটোটির মতোই হলো। বিজ্ঞানীরা এই বিলের বিরুদ্ধে সমরদপ্তরের কবল থেকে পারমাণবিক গবেষণাকে উদ্ধার করে অসামরিক কর্তৃত্বাধীনে আনার জন্য প্রবল আন্দোলন শুরু করলেন—বিজ্ঞানের সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে শুরু হলো বিজ্ঞানীদের ধর্মযুদ্ধ। সেই ধর্মযুদ্ধ আজও চলেছে। ১৯৫৭ সালের ১২ই এপ্রিল ম্যাকস বোর্ন (Max Born), অটো হান, উইৎস্যাকার প্রমুখ আঠারোজন বিশ্ববিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী যৌথভাবে স্বাক্ষরিত প্রকাশ্য এক বিবৃতির মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে একযোগে ঘোষণা করেছেন যে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন, উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং পরীক্ষার সঙ্গে তাঁরা নিজেদের কোনো ক্রমেই জড়িত করবেন না বা তার লেশমাত্র সংস্পর্শে আসবেন না। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের এই ধর্মযুদ্ধ আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং এই ধর্মযুদ্ধে অংশীদার হয়েছেন সারা বিশ্বের অগণিত শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ।

সংস্কৃতিসেবীদের উদ্দেশে

মস্কো নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আবেদন

আমাদের আধুনিক সংস্কৃতি আমাদের পূর্বপুরুষদের শতাব্দীব্যাপী প্রচেষ্টার ফল। এই সংস্কৃতিতে সকল মানুষের সমান অধিকার। এই সংস্কৃতি সকল মানুষের ঐশ্বর্য। প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতি আছে যা নিয়ে তার বিশেষ গর্ব। জাতীয় সংস্কৃতি সাধারণ সংস্কৃতিরই বিশেষ এক-একটি অঙ্গ। আমরা এই সংস্কৃতিরই ধারক ও বাহক। এই সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ আমাদের ওপরেই ন্যস্ত।

কিন্তু আমাদের এই পৃথিবী অবিশ্বাস ও আতঙ্কে ভারাক্রান্ত। আমাদের এই পৃথিবীতে যুদ্ধের ছায়া। এই যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সম্পদ ও মেধার অর্থহীন অপচয় চলেছে, যার ফলে আমাদের এই সংস্কৃতি খুবই বিপন্ন।

চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, আক্রমণের মনোভাব ও মানব-জাতির প্রতি অবজ্ঞা ক্রমেই বেশি বেশি মাত্রায় প্রকট হচ্ছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে মানুষকে সামিল করা হচ্ছে আরো বেশি বেশি সংখ্যায়। একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রচারযন্ত্র দিশেহারার মতো জাগিয়ে তুলছে যুদ্ধ উন্মাদনা। তরুণদের একাংশের সামনে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তারা অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে তাদের মধ্যে বিপথগামীদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

যে অর্থে বিদ্যালয় নির্মিত হতে পারত তা ব্যয়িত হচ্ছে অস্ত্রসজ্জায়। যে সেলুলোজে বিদ্যার্থীর কাগজ তৈরি হতে পারত তা ব্যবহৃত হচ্ছে বিস্ফোরকে। আধুনিক টেক্নোলজির কল্যাণে মুহূর্তের মধ্যে সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের যে আশ্চর্য ব্যবস্থা আমাদের আয়ত্তাধীন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে—জ্ঞানের প্রসারের জন্যে নয়, জাতিতে জাতিতে ঐক্যসাধনের জন্যে নয়—ভুল বোঝাবুঝি ও অবিশ্বাসকে আরো ব্যাপক করে তোলবার জন্যে। মানুষের মনকে বিকৃত করে তোলা হচ্ছে জাতিবিদ্বেষ ও ঔপনিবেশিক মূঢ়তায়।

এই অবস্থা সমগ্র মানবজাতিকেই দরিদ্র করে তুলেছে। এই অবস্থা মানুষের ভবিষ্যতকেই বিপন্ন করে তুলেছে।

লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক ও শিল্পীগণ, মানবিক সংস্কৃতির ঐশ্বর্যময় ক্ষেত্রে আপনাদের বিচরণ। আমরা আপনাদের কাছে আবেদন করি, বর্বরতার দিকে এই অবনমনকে, মানুষের ইতিহাসের এই অভাবিতপূর্ব বিপর্যয়কে আপনারা প্রতিরোধ করুন। উপনিবেশবাদ ও জাতিবিদ্বেষের আবর্তে মানুষের অধঃপতন এই মুহূর্তেই বন্ধ হোক। নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রত্যেকেরই অবশ্যই গর্ববোধ থাকবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে অপরের সৃষ্টি সম্পর্কে থাকবে উদ্ধত ও অন্ধ ঘৃণা। না মানুষে মানুষে, না জাতিতে জাতিতে, না জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে পদ্ধতিতে।

অজ্ঞতাপ্রসূত এই ঘৃণাকে আমাদের অবশ্যই দূর করতে হবে। বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে ও বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যাতে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ হয় সে-চেষ্টাও করতে হবে আমাদের। তাহলেই আমরা যুদ্ধোন্মাদনা প্রসূত ধ্যানধারণাকে নিষ্ক্রিয় করতে পারব। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আলাপ-আলোচনার। আমরা সমর্থন করব সেই সমস্ত সংগঠন বা ক্রিয়াকলাপকে যা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বা আরো বিশেষ করে বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মহাদেশের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানকে প্রসারিত করবে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি কাজ করা যেতে পারে। যেমন, ছাত্র বিনিময়, খেলাধুলার আসর, তরুণদের জন্যে ভ্রমণের ব্যবস্থা, একই ধরনের পেশায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ, বিশেষ সম্পর্কে সম্পর্কিত যৌথ শহর (প্রত্যেক নগরেই যা গড়ে ওঠা উচিত), অনুবাদ, চলচ্চিত্র এবং রেডিও ও টেলিভিশন প্রোগ্রাম বিনিময়, প্রদর্শনী, জলসা ও সাংস্কৃতিক বৈঠক ইত্যাদি। এ-ধরনের ক্রিয়াকলাপ যত সূক্ষ্মই হোক একটি সূত্র গড়ে তোলে এবং সৌভ্রাত্রের বন্ধনকে দৃঢ় করে, যা একদিন সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবে। আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নাগরিকদের দিকে। তাদের জন্যে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মানবিক সৌভ্রাত্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে তারা বড় হয়ে ওঠে।

আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন হব। আমাদের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলব। যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি তাকে আমরা অটুট রাখব, অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলব। আর এই উত্তরাধিকারকেই আমরা তুলে দেব আমাদের পরবর্তীদের হাতে, যাদের জন্যে আমরা বেঁচে আছি।

আমরা তাদের কাছে তুলে ধরব শান্তি-সংগ্রামের শহীদ জোলিও-র উক্তি : মানুষকে যত রকমের লড়াই করতে হয় তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও মহৎ হচ্ছে শান্তির জন্যে সংগ্রাম।


য়